স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

৬৬ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা।। ২৪ মার্চ - ২০১৪।। ৯ চৈত্র - ১৪২০।। website: www.eswastika.com

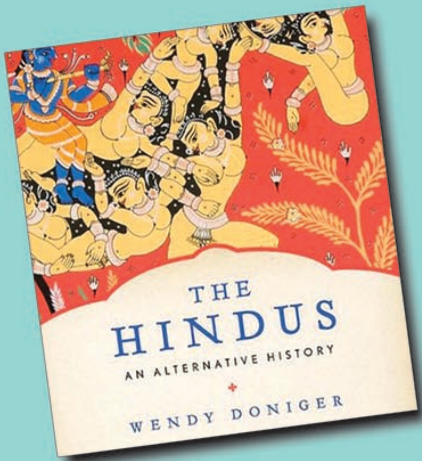

ডোনিগারের

দ্য হিন্দুজ

লেখক স্বাধীনতার নামে হিন্দুত্বকে বিকৃত করার অপচেষ্টা কেন?

বিজেপির নজরকাড়া প্রার্থী

বাঁকুড়ায় ডাঃ সুভাষ সরকার

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

খোলা চিঠি : আসুন, সবাই মিলে মোদীকে সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করি □ সুন্দর মৌলিক □ ৯

মুলায়মের পর আন্না : রামলীলায় ফ্লপ শো □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

আর না হাজারে— এবার তোমার অরাজনীতির ভেক খুলে পড়েছে □ এন সি দে □ ১১

ডোনিগারের বই নিয়ে তথাকথিত প্রগতিশীলদের চূড়ান্ত নোংরামো □ ১৩

'দ্য হিন্দুজ : অ্যান অল্টারনেটিভ হিস্ট্রি' : ইতিহাসের বিকৃতি □ ১৫

বাক্‌স্বাধীনতার প্রবক্তাদের লক্ষ্য বিষয়ভিত্তিক : হিন্দুত্বের ওপর প্রণীত পুস্তক নিয়ে বিতর্ক □ বলবীর পুঞ্জ □ ১৬

কেন নরেন্দ্র মোদী? □ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় □ ১৯

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার □ প্রদীপ ঘোষ □ ২০

তড়া আঁটপুরের শ্যামের পাট ও পরমেশ্বর দাস □ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল □ ২২

মোদীর প্রচার অভিযানে চিরাচরিত মানসিকতা পরিবর্তনের ডাক দেওয়া জরুরি □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ২৭

সাক্ষাৎকার : ডঃ কৃষ্ণগোপাল □ ২৯

বঙ্গেশ্বরী কি ভারতীয় রাজনীতির ট্রোজান হর্স □ শ্রীচৈতন্য বর্ধন □ ৩১

ধর্ম বনাম রিলিজিয়ন □ অমলেশ মিশ্র □ ৩২

'হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই'— এক অলীক স্বপ্ন □ সুহাস বসু □ ৩৬

বাঁকুড়া কেন্দ্রের নজরকাড়া বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকার □ ৩৮

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

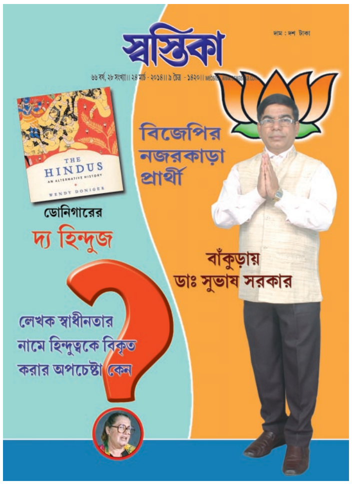

পৃঃ ১৩-১৮

নিয়মিত বিভাগ

নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ □ অঙ্গনা : ২৬ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □ □ চিঠিপত্র : ৩৫ □
সমাবেশ-সমাচার : ৩৭□ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪১-৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ৯ চৈত্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৫, ২৪ মার্চ - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪৪০৮০৩৪৩
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯
অফিস : ৯৮৭৪৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

‘মোদীনমিক্স’

দেশের প্রধানমন্ত্রী পদের একচ্ছত্র দাবীদার নরেন্দ্র মোদী আর ইকোনমিক্সের এক অত্যাশ্চর্য মেলবন্ধনে রচিত হয়েছে ‘মোদীনমিক্স’। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ভারে জর্জরিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের এক দশকের দুর্নীতি ও তোষণ নীতি ভারতবর্ষের অর্থনীতির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। এই এক দশকের ঘড়ির কাঁটা বিপরীতমুখী করতে অর্থনীতিবিদরা তাই আস্থা রাখছেন ‘মোদীনমিক্সে’ই। কিন্তু কি এই ‘মোদীনমিক্স’? তা দেশের অর্থনীতির হাল ফেরাবেই বা কেমন করে? বিশ্লেষণে কাঞ্চন গুপ্ত ও অশোক মালিক।

দাম একই থাকছে— ১০ টাকা মাত্র। সত্বর কপি বুক করুন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সংবাদমাধ্যমকে কেজরিওয়ালের হুমকি

সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিক এখন হইতেছে কলুর বলদ। রাজনৈতিক দল এবং নেতার প্রশংসা করিলে বাহবা জুটিবে আর সমালোচনা করিলে হুমকি ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইবে। এই দেশে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকের স্বাধীনতা সত্যের অপলাপমাত্র। এখন নিরপেক্ষ সংবাদপত্র বা নিরপেক্ষ সাংবাদিককে দূরবীণ দিয়া খুঁজিতে হয়। তবুও নানান ঝুঁকি ও প্রলোভন সত্ত্বেও বহু সংবাদপত্রে সত্য ঘটনা প্রকাশিত হইয়া থাকে। বহু সাংবাদিক মেরুদণ্ড না বিকাইয়া সাংবাদিকতার ধর্ম পালন করিয়া থাকেন। যাহারা নিজেদের ধর্ম বিকাইয়া দিতে প্রস্তুত তাহাদের লইয়া সরকার এবং রাজনৈতিক দলের কোনো সমস্যা থাকে না, কিন্তু যাহারা দলমত নিরপেক্ষভাবে কাজ করিবার ব্রতে দীক্ষিত তাহাদের লইয়াই সমস্যা হয়। বাম আমলে এই সমস্যা হইয়াছে, তৃণমূল আমলেও হইতেছে। বাম আমলে বাম সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বুদ্ধ ভট্টাচার্যের বন্দনা বহু সংবাদপত্র এবং সাংবাদিক করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁহারা যখন বাম সরকারের অত্যাচার নির্যাতনের ঘটনাগুলি পাঠকের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন তখনই তাহাদের মন্দ দৃষ্টিতে দেখা শুরু হইয়াছে। বর্তমানে তো আরও চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিতেছে। যে সাংবাদিক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে ভজনা করিবেন তিনি রাজ্যসভার সদস্য হইতে পারিবেন অন্যথায় জেলের ঘানি বা লাঠৌষধি। বর্তমানে অরবিন্দ কেজরিওয়াল হইতেছেন এইরকম এক তোষামোদ-প্রিয় ব্যক্তি। সব সময় যিনি নিজের প্রশংসা শুনিতেই অভ্যস্ত। তিনি সবসময়ই অন্যদের কাজকর্ম লইয়া প্রশ্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁহার উত্তর দিবার বালাই নাই।

বহু মানুষ প্রচারমাধ্যমের অন্তরালে থাকিয়া সমাজের কাজ করিতেছেন, দেশের সেবা করিতেছেন। তাঁহারা মিডিয়ার ছোঁয়া হইতে দূরে থাকিতেই পছন্দ করেন। কিন্তু কেজরিওয়াল সব সময় মিডিয়ার প্রচারের আলোয় থাকিতেই অভ্যস্ত। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত তাঁহার আগ্রহ কেবল প্রচারের আলোর দিকেই। দলের ব্যতিক্রমী ভিন্নধর্মী কাজকর্ম এই জন্যই যাহাতে প্রচারমাধ্যম তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে। মানুষের কল্যাণের অপেক্ষা মিডিয়ার প্রচারের দিকেই তাঁহার বেশি লক্ষ্য। এই কাজে বহু সাংবাদিকের তিনি সহায়তা পাইয়াছেন। আর এই জন্যই আমরা দেখিতে পাইতেছি কেজরিওয়াল-ভজনাকারী বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের বহু সাংবাদিককে তিনি লোকসভায় তাঁহার দলের প্রার্থীও করিয়াছেন। কিন্তু সেই মিডিয়ায় যখন তাঁহার ধাপ্পাবাজি প্রকাশ হইয়াছে তখনই তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সংবাদপত্রকে হুমকি ও সাংবাদিকদের জেলে পুরিবার হুঁশিয়ারি দিতেছেন। বস্তুত কেজরিওয়ালও যে 'ধোয়া তুলসীপাতা' নহে আজ তাহা সংবাদপত্রে তথ্যপ্রমাণসহ প্রকাশিত হইতেছে। আম-আদমি পার্টির অর্থের উৎস লইয়া, এই দলের পদযাত্রার নামে বিভিন্ন শহরে যে গুণ্ডামি চলিতেছে—তাহাও প্রকাশিত হইতেছে। এই জন্য সাংবাদিকদের হুমকি।

আম-আদমী পার্টি এবং আমেরিকার গোপন চুক্তি যখন ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে তখন তাহা থামাইবার জন্যই ইহা ব্যতীত কোনও উপায় কেজরিওয়ালের হাতে নাই। আমেরিকার পুরনো বন্ধু মনমোহন সিং এবং তাঁহার দলের অবস্থা আজ যখন শোচনীয় হইয়াছে তখন অরবিন্দ কেজরিওয়ালই আমেরিকার একমাত্র ভরসা। ভারতীয় নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করিবার জন্যই আমেরিকার এই উদ্যোগ। যাঁহারা ভাবিতেছেন আম-আদমী পার্টি এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালই আজকের দেশের একমাত্র আশাভরসা তাহারা ভুল ভাবিতেছেন। যে ব্যক্তি তাঁহার গুরুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, তিনি দেশের মানুষের কল্যাণ করিবেন কেমন করিয়া? মূলত আন্না হাজারের জনপ্রিয়তা লুঠ করিয়াই আজ তাঁহার এত রমরমা। মিডিয়াও আন্না হাজারের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে তুলিয়া ধরিয়াছে। মুকতার আব্বাস নাকভি এই জন্যই বলিয়াছেন, 'এক রাতেই এই কেজরিওয়ালকে মিডিয়া হিরো বানাইয়া দিয়াছিল। আর সেই মিডিয়াকেই এখন গাল পাড়িতেছেন তিনি।' বস্তুত যে পাত্রে ভোজন করিয়া থাকেন সেই পাত্রকেই অপরিস্কার করিতেছেন কেজরিওয়াল। এমন মানুষের স্থান কোথায়?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ঠাকুরকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দেখেছি, স্ত্রীমাত্রেই মাতৃভাব—তা যে-জাতির যেরূপ স্ত্রীলোকই হোক না কেন। দেখেছি কিনা!—তাই এত করে তোদের ঐরূপ করতে বলি এবং মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলি। মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তান-সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে—বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বাধীনোত্তর ভারতে নজিরবিহীন ঘটনা

ভোটে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছেন কংগ্রেস-নেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৭৭-এ জরুরী অবস্থা পরবর্তী নির্বাচনেও এত করুণ দশা হয়নি কংগ্রেসে। পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে কংগ্রেসের যা হাল তাতে মালদা-মুর্শিদাবাদ বাদে আর ক'টা আসনে দলের জামানত বাঁচবে তা নিয়ে সন্দিহান খোদ কংগ্রেস-নেতারাই। যে কারণে প্রদীপ ভট্টাচার্য, মানস ভুঁইয়ার মতো প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতিরা রাহুল গান্ধীর শত সহস্র অনুরোধেও ভোটে দাঁড়াতে রাজি হলেন না। এই প্রদেশে কংগ্রেসের না হয় এই হাল। কিন্তু সারা দেশে? পরিস্থিতি যে কতটা খারাপ তা বোঝা যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কে ভাসান নির্বাচনী প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নেওয়ায়। এমনকী যোধপুর কেন্দ্র থেকে চান্দ্রেশ কুমারী কাটোচের মতো প্রার্থীও এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নারাজ। সূত্রের খবর কাটোচ হিমাচল থেকে একটি নিরাপদ আসন চেয়েছিলেন। কিন্তু ওই রাজ্যের নেতৃত্ব তা দিতে অপারগ হওয়ায় শেষ মুহূর্তে এবারের মতো রাজনৈতিক সন্ন্যাস তিনি নিতে চাইছেন বলে এখনও পর্যন্ত খবর। দেশজুড়ে তাবড় কংগ্রেস নেতাদের এই মনোভাবে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বেশ ফাঁপরে। কংগ্রেস-নেতাদের ব্যাখ্যাই বলছে সারা দেশে প্রবল মোদী ঝড়ের ভয় তো তারা পাচ্ছেনই। সেইসঙ্গে কংগ্রেসের প্রতি সাধারণ মানুষের অপরিসীম ঘৃণাবোধও তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ঘৃণা যে কতটা মারাত্মক হতে পারে বিগত দিল্লী নির্বাচন-ই তার প্রমাণ। দেশবাসীর এই কংগ্রেস-বিরোধী মানসিকতা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আরও প্রকট হবে বলে কংগ্রেস-নেতাদের আশঙ্কা।

এদের আশঙ্কা যে খুব একটা অমূলক নয় বিভিন্ন প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষাতেই তার প্রমাণ মিলেছে। এখন একশ' কেন, ষাট-সত্তর আসনও কংগ্রেস-ভাগ্যে জুটবে কিনা তা নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভোটে দাঁড়ানোর ঝুঁকি নিয়ে মুখ পোড়াতে চাইছেন না কেউই। যেমন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ চৌধুরী তাঁর হোশিয়ারপুর কেন্দ্র থেকে দাঁড়াতে ঘোরতর

জি কে ভাসান

শতপাল মহারাজ

মানস ভুঁইয়া

অনিচ্ছুক। কিন্তু পাঞ্জাব কংগ্রেস তাঁকে কোনও নিরাপদ আসন দিতে আপাতত ব্যর্থ। পাউরি গাড়োয়ালের সাংসদ শতপাল মহারাজ তো নিরাপদ কোনও আসন না পেয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোরই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো কংগ্রেসের যে হেভিওয়েটরা ভোটে দাঁড়াতে চাইছেন তাদের আবার টিকিট দিতে কংগ্রেস-নেতৃত্বের বাধো বাধো ঠেকছে। কারণ এদের বিরুদ্ধে রয়েছে দুর্নীতির পাহাড়-প্রমাণ অভিযোগ। আরও ভালোভাবে বললে, মূলত এদের জন্যই কংগ্রেসের ভাগ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত-র তকমা জুটেছে। যেমন সুরেশ কালমাদি। কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারির খলনায়ক এই ব্যক্তিটিকে পুনে থেকে টিকিট দিতে কোনওমতেই চাইছেন না কংগ্রেস-নেতৃত্ব। কিন্তু মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য এই দুর্নীতিগ্রস্তদের তৈরি থাকতে বলা হচ্ছে। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও সত্যি যে কংগ্রেস-নেতৃত্ব আশা করছে কংগ্রেস ষাট-সত্তরটি আসন পেলেও তৃতীয় ফ্রন্টকে কিছুদিনের জন্য সমর্থন দিয়ে সরকার টিকিয়ে রাখতে পারবে। তারপর ভি পি সিং, দেবেগৌড়া বা আই কে গুজরালের মতো এক বছরেরও কম সময়ে সরকার ফেলে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনে চলে যেতে পারবে। তখন পূর্ববর্তী দুর্নীতির স্মৃতি জনগণের চোখে ফিকে হয়ে যাবে এবং সেই সুযোগে দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস হেভিওয়েটদের মাঠে নামিয়ে ফায়দা তুলবে কংগ্রেস। যদিও কংগ্রেস-নেতৃত্বের এহেন 'সুদূর-প্রসারী' পরিকল্পনা সূর্যের পশ্চিমে ওঠার মতোই অবাস্তব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ বিভিন্ন প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষায় বিজেপি-র আসন ২২৫-২৩০ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে বলে দেখানো হয়েছে। যেভাবে মোদী-ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে তাতে বিজেপি-র ২৭২-এর বেশি আসন পাবার আশা সত্যি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তা না হলেও ম্যাজিক ফিগারের কাছাকাছি পৌঁছলেও বিজেপি-র এক দশক বাদে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন একপ্রকার সুনিশ্চিত। তাই কর্মীদের মনোবল যোগাতে রাহুল গান্ধীর অর্বাচীনের মতো বক্তব্য--- 'এই লোকসভা নির্বাচন আসলে সেমিফাইনাল, ফাইনাল নয়', কংগ্রেসের বালখিল্যসম নীতিরই প্রতিফলন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

কেন্দ্রের সড়ক নির্মাণের গাফিলতিতেই মাও-হামলা রাজ্যে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ১১ মার্চ সি আর পি এফ জওয়ানদের ওপর হামলার জন্য যেভাবে জাতীয় সড়ককে বেছে নেওয়া হলো, তারপরে সড়ক নির্মাণের কাজে সরকারের গাফিলতির দিকটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। নকশাল দমনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের নানাবিধ ব্যর্থতার মধ্যে এই বিষয়টি যে অন্যতম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। জাতীয় সড়ক ২২১ চওড়া করার কাজ চালু হয়েছিল ২০১০-এর মে মাসে। মূলত এক লেনের সড়কটিকে দু'লেনে পরিবর্তিত করার কাজ শুরু হয়েছিল। দু'বছরের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু গত চার বছরে এরকম অনেক চূড়ান্ত সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজটি আজও শেষ হয়নি। চার বছর পরেও অন্ধ্রপ্রদেশে বিজয়ওয়াড়া থেকে ছত্তিশগড়ের জগদলপুর পর্যন্ত ৩২৯ কিলোমিটার বিস্তৃত সড়ক তৈরির কাজের মাত্র ত্রিশ শতাংশ অগ্রগতি হয়েছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের, যে ছত্তিশগড়ে নকশাল-দৌরাত্ম্য মারাত্মক বেশি সেখানেই সড়ক-নির্মাণের পরিমাণ সবচেয়ে কম। (সারণী দ্রষ্টব্য)

মাওবাদীরা এই সুযোগটা খুব ভালোভাবে কাজে লাগাচ্ছে। সাম্প্রতিকতম হামলার ঘটনায় সি আর পি এফ জওয়ানদের লক্ষ্য করার পাশাপাশি নির্মাণের জন্য দু'ট্রাক ভর্তি বিটুমিন মেশানো সরঞ্জামও ধ্বংস করে ফেলে। বিশেষজ্ঞরা একে কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলতে নারাজ। পূর্ত দফতরের রেকর্ড বলছে গত চার বছরে অন্তত ছ'টি ঘটনায় রাস্তা নির্মাণের সরঞ্জাম ভর্তি ট্রাক জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ২০০৯-এ প্রথমবার কেন্দ্র নকশাল-অধ্যুষিত আটটি রাজ্যের ৩৪টি জেলায় রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা করে। ২০১৪-র ১ মার্চ পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের নিরিখে দেখা যাচ্ছে ছত্তিশগড়ে এ ব্যাপারে কাজ হয়েছে সবচেয়ে কম। পরিকল্পিত ২০১৯ কিলোমিটারের মধ্যে এখনও পর্যন্ত শেষ হয়েছে মাত্র ৬৩৭ কিলোমিটার। মোট কাজে

সারণী

বেহাল সড়ক নির্মাণ

২০০৯-এ মাও অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে সড়ক-নির্মাণের যে প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল ২০১৪-র ১ মার্চ পর্যন্ত সেই কাজের অগ্রগতি।

রাজ্য	গৃহীত প্রকল্প*	কাজ হয়েছে*
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬২০	৫২৩
বিহার	৬৭৪	৬২১
ছত্তিশগড়	২০১৯	৬৭৩
ঝাড়খন্ড	৭৬০	২৯৯
মধ্যপ্রদেশ	২৩৭	১০৭
মহারাষ্ট্র	৪৭০	২৮৮
ওড়িশা	৬১৫	২৭৪

*কিলোমিটারের ভিত্তিতে সড়ক নির্মাণের নিরিখে।

যা মাত্র ৩৩ শতাংশ। এই রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা যে মাও-প্রভাব কমানোর সবচেয়ে উপযুক্ত পথ তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত। কারণ এর ফলে মাও-প্রভাবিত এলাকায় পৌঁছতে যেমন নিরাপত্তারক্ষীদের সুবিধে হয়, অন্যদিকে মাও-অধ্যুষিত স্থানের মানুষেরও বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ে। যা সামগ্রিকভাবে মাও-প্রভাব কমাতে সহায়ক হয়। কিন্তু কেন্দ্রের অকর্মণ্যতায় রাস্তা নির্মাণের গাফিলতিতে একদিকে যেমন মাও-হামলার ঘটনা বাড়ছে, অন্যদিকে তেমন হামলার পর নির্মাণকর্মীরা ভয়ে পালাচ্ছেন আর হামলায় ট্রাক ইত্যাদি ওড়ানোয় আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি যা হবার তা কনট্রাক্টরের হচ্ছে। কনট্রাক্টাররাও বলছেন দুর্গম এলাকায় রাস্তা নির্মাণের সরঞ্জাম পৌঁছনো এমনিতেই নিশি-আতঙ্কের মতো। তার ওপর সুরক্ষার নিশ্চয়তা সরকার দিতে না পারলে ভবিষ্যতে একাজে আর কোনও কনট্রাক্টারকেই পাওয়া যাবে না। কাছাকাছি পুলিশ বা নিরাপত্তারক্ষী ক্যাম্প করলেও যে সমস্যা মিটতো, সরকারের রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে তাও আপাতত ভেস্তে গেছে।

পরিস্থিতি এমনই একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ছত্তিশগড়ে ৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার জন্য টেন্ডার ডেকেও ঠিকেদার পাচ্ছিল না কেন্দ্র। শেষে রাজ্যের পরামর্শে পুরো প্রজেক্টটাকে টুকরো টুকরো করে ছোটো ছোটো ঠিকাদারদের দিয়ে পরিস্থিতি ম্যানেজ করার চেষ্টা হয়। এখন গত ৫ মার্চ ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ায় পুরো কাজই থমকে গেল বেশ কিছুদিনের জন্য।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

থার্ড ফ্রন্ট বিচ্ছিন্ন, ইউপিএ উদ্বিগ্ন, এনডিএ উল্লসিত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আর মাত্র পনেরো দিন পরেই ষোড়শ লোকসভার নির্বাচন শুরু হয়ে যাচ্ছে। ৭ এপ্রিল শুরু হয়ে শেষ হবে ১২ মে। নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে ১৬ মে। বিজেপি ও কংগ্রেস— দুই জাতীয় দলই নিজেদের প্রায় সব প্রার্থীরই নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। এনডিএ এবং ইউপিএ— দুই জোটই এখন নতুন শরিক যোগাড় করতে পুরোদমে নেমে পড়েছে। বিজু জনতা দল (বিজেডি), জয়ললিতা (এ আই এ ডি এম কে) ও অগপ (অসম গণপরিষদ) থার্ড ফ্রন্ট-এর সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করায় তা এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। আবার তামিলনাড়ুতে এ আই এ ডি এম কে-র সঙ্গে সিপিএম ও সিপিআই যে গাঁটছড়া বেঁধেছিল টিকিট ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে তাও ব্যর্থ হয়ে গেছে। সম্প্রতি এস পি, জনতা দল-ইউ, জনতাদল— এস, চারটি বামপন্থীদল থার্ড ফ্রন্টকে নতুন করে গড়তে উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু নীতিশ কুমার, জে জয়ললিতা, মুলায়ম সিং ও এইচ ডি দেবগৌড়া--- সবাই প্রধানমন্ত্রীপদের দাবিদার হওয়ায় এই চেষ্টা কতদূর সফল হবে তা নিয়ে ওয়াকিবহাল মহল গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাদের অভিজ্ঞতায় এইসব দলগুলি যতক্ষণ আলাদা থাকে ততক্ষণ ভাল, একসঙ্গে হলেই এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি করে।

ইউপিএ-র অবস্থাও এদের থেকে আলাদা নয়। বিহারে রামবিলাস পাসোয়ান-এর এলজেপি ইউপিএ জোট ছেড়ে বেরিয়ে এসে এনডিএ-তে যোগ দিয়েছে। ঝাড়খণ্ডে জে এম এম (ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা)-কংগ্রেসের জোট খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধ্রে কংগ্রেসের এমন শোচনীয় অবস্থা আগে কখনও হয়নি। দিল্লীতে আম-আদমি (এ এ পি)-র সঙ্গে কংগ্রেসের গোপনচুক্তি আজ আর গোপন নেই। যে দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসকে তাড়ানোর জন্য এএপি সোচ্চার হয়েছিল, ক্ষমতার লোভে তাদের সমর্থন নিয়েই দিল্লীতে তারা সরকার গড়েছে। কেজরিওয়াল-এর গুরু আন্না হাজারে এখন আর শিষ্যের পাশে নেই। তৃণমূল-নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্নার সঙ্গে জোট গড়ার যে চেষ্টা করেছিলেন, রামলীলা ময়দানে কাণ্ডের পর তা মাঠে মারা গেছে।

অন্যদিকে, নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করে বিজেপি সারা দেশে ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সারা দেশ জুড়ে যে 'মোদী ওয়েভ' বইছে তা একরকম নিশ্চিত করেই বলা যায়। সম্প্রতি আমেরিকা-ভিত্তিক পিউ রিসার্চ সেন্টার (Pew Research Center)-এর এক সমীক্ষাতে বলা হয়েছে— ৬৩ শতাংশ ভারতীয়ই মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। এমনকি ভারতের সব কয়টি নির্বাচনী সমীক্ষাতেই বিজেপি-কে সবার থেকে এগিয়েই দেখানো হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর সভাগুলিতে জনতার বিশাল উপস্থিতিই জাতির এই ভাবনাকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে। এনডিএ-তে শরিকদের যে নতুন করে বিন্যাস হচ্ছে তা মোদীর হাতকেই শক্ত করছে। রামবিলাস পাসোয়ানের পর জনপ্রিয় দলিত নেতা উদিতরাজ-ও সম্প্রতি এনডিএ-তে যোগ দিয়েছেন। নিজেদের এই হাল দেখে থার্ড ফ্রন্ট বিচ্ছিন্ন, ইউপিএ উদ্বিগ্ন, এনডিএ উল্লসিত।

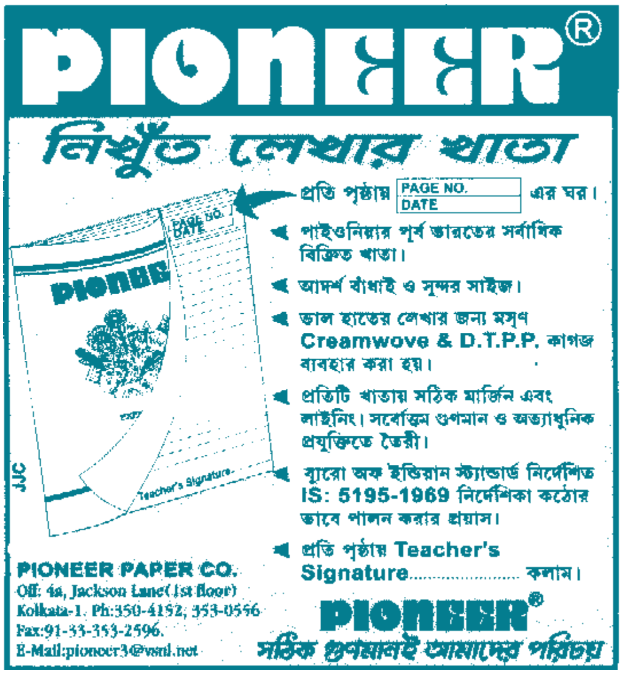

আসুন, সবাই মিলে মোদীকে সাম্প্রদায়িক প্রমান করি

(পর্ব এক)

মাননীয় নেতানেত্রীগণ
মূল, তৃণমূল কংগ্রেস ও বামদল

এবার আপনাদের সকলকেই চিঠি লিখছি। কারণ, আপনারা সকলেই ভোটের ময়দানে নেমে পড়েছেন একে অপরের বিরুদ্ধে। তবু আপনাদের মধ্যে এক অদ্ভুত মিল। আপনারা সবাই বিজেপি এবং বিশেষ করে তাঁদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীকে সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। দেখুন, ভোটে দাঁড়ালে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতেই হয়। যুক্তি দিয়ে না হলে কুযুক্তি দিয়েও আক্রমণ করতে হয়। আপনাদের মতো আমিও মনে করি বিজেপি-কে ঠেকাতে অন্য কোনও অস্ত্র কাজে না লাগলে ভোঁতা 'সাম্প্রদায়িক' অস্ত্রটা এখনও একমাত্র সম্বল। আর আপনাদের সাহায্য করতে চাই বলে সকলের উদ্দেশে এই চিঠি। পড়ুন, কাজে লাগান, কাজে লাগবে।

বিজেপি তথা মোদীকে সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করার জন্য আপনাদের ছোট্ট পদক্ষেপ নিতে হবে।

ভারতের ইতিহাসকে অস্বীকার করুন।

কংগ্রেসের রাহুলবাবা ইদানীং মহাত্মা গান্ধী হত্যার জন্যও বিজেপি-কে দোষারোপ করতে শুরু করেছেন। কিন্তু ইতিহাস বলছে ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর সময় ভারতীয় জনতা পার্টি কেন তার আদি দল জনসঙ্ঘেরও জন্ম হয়নি। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে সে সময় শাসকদল মানে কংগ্রেস কোনও কিছু বিবেচনা না করেই বিজেপি-র আদর্শ সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আর এস এস কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু বছর গড়াতেই প্রমাণের অভাবে সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হয় সরকারকে। এসব ইতিহাস রাহুল গান্ধীর সিলেবাসেই ছিল না। মা সোনিয়া গান্ধীর তো নয়ই। সুতরাং তাঁরা জানেন না যে কংগ্রেস সরকারের তৈরি কাপুর কমিশনের সেই রিপোর্ট। একটুখানি এখানে তুলে দিলাম।

...RSS as such were not responsible for the murder of Mahatma Gandhi, meaning thereby that one could not name the organisation as such as being responsible for that most diabolical crime, the murder of the apostle of peace. It has not been proved that they (the accused) were members of the RSS...

---Kapur Commission Report

সৎ বুদ্ধি দিচ্ছি, এসব ইতিহাস পুড়িয়ে দিন। মানুষকে জানতে দেবেন না। তাহলে যে আর এস এস তথা বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদীকে সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করা যাবে না। আর সেটাই আমাদের লক্ষ্য।

এখানেই শেষ নয়, ইতিহাস থেকে যেগুলো মুছে ফেলতেই হবে সেসব আরও আছে। আর সেসব কংগ্রেসের মাথা মানে জওহরলাল নেহরু কিংবা ইন্দিরা গান্ধীর হাতেও তৈরি করা ইতিহাস।

১। ১৯৬৩ সালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (গান্ধী হত্যা ১৯৪৮ সালে) প্রজাতন্ত্র দিবসে লালকেল্লার কুচকাওয়াজে অংশ নেওয়ার জন্য আর এস এস-কে আমন্ত্রণ জানান। কারণ, ওই দেশদ্রোহী সংগঠনের স্বয়ংসেবকরা ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের সময় দেশের জন্য এক বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। কেউ কেউ এই আমন্ত্রণের বিরোধিতা করায় নেহরু বলেছিলেন, তিনি চান দেশপ্রেমিকরা অংশ নিন প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে।

২। এরপর ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। এবার প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী দিল্লীর পরিবহণ পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেওয়ার জন্য ভরসা করেছিলেন আর এস এস-এর উপরেই।

৩। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় দেশের আইন কানুন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও আর এস এস-এর ওপরেই ভরসা করেছিলেন কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

রাহুল বাবাজিকে বলুন এসব ইতিহাস সাধারণ মানুষ বেশি বেশি করে জানার আগে মুছে দেওয়া হোক। তা না হলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নামে কুৎসা করে নিজের পরিবারের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়ে যাচ্ছে।

সেই আর এস এসের শাখায় তৈরি হওয়া অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবাণীরা দেশে সুশাসন দেওয়ার প্রমাণ আগেই রেখেছেন। আবার এক স্বয়ংসেবক দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে চলেছেন। কিন্তু তা হতে দেওয়া যাবে না। রুখতেই হবে। মোদীকে আটকাতেই হবে। তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে ইতিহাসকে মুছে দিই। পুড়িয়ে দিই। জ্বালিয়ে দিই।

বুঝতেই পারছেন মোদীকে দেশদ্রোহী, সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করাটা খুব সহজ হবে না।

তবে আরও রাস্তা আছে।

দফায় দফায় বলব।

— সুন্দর মৌলিক

মুলায়মের পর আন্না : রামলীলায় ফ্লপ শো

সারা ভারতে লোকসভার নির্বাচন ৭ এপ্রিল শুরু হলেও পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ দফার নির্বাচন পর্বের শুরু হবে ১৭ এপ্রিল। প্রথম দফার নির্বাচন হবে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায়। এরপর ভোট হবে ২৪ এপ্রিল, ৩০ এপ্রিল, ৭ মে এবং ১২ মে। এবার নিঃসন্দেহে লড়াইটা হবে সমানে সমানে। রাজ্যের ৪২টি লোকসভার আসনেই বিজেপি, তৃণমূল, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস যে সর্বশক্তি দিয়ে লড়বে তা প্রচারের বহর দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। ফলে ভোট কাটাকাটির অঙ্কে শেষ পর্যন্ত কোন দলের প্রার্থীরা শেষ হাসি হাসবেন তা বলা শক্ত। তবে কতকগুলি বিষয়ে নজর রাখবেন। যেমন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি রাজ্যজুড়ে জনসমর্থনের প্রবল ঝড় নেই। রাজ্যে একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা, কৃষি ও শিল্পে উন্নয়নের ব্যর্থতা ও পুলিশ প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতা বাংলার মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বেসর্বা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেভাবে আন্না হাজারে বেইজ্জত করেছেন তার প্রতিবাদে তৃণমূল কর্মীরা রাজ্যের কোথাও কোনও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এমন ঘটনা জানা নেই। দিদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যে খোয়াব দেখেছিলেন সেই খোয়াবে ঝামা ঘষে দিয়েছে দিল্লীর রামলীলা ময়দানের ফ্লপ শো। এর আগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো মুলায়ম সিং যাদব দিদিকে চূড়ান্ত হেনস্থা করেছিলেন। সেই ঘটনা থেকে তৃণমূল নেত্রী যে কোনও শিক্ষাই নেননি তা স্পষ্ট হয়েছে আন্নার থাপ্পড়ে। দিদি আন্নার কথায় নেচেছিলেন। আন্না যে তাঁকে পথে বসাবেন তিনি বুঝতে পারেননি। দোষটা যদিও দিদির তবু তিনি বলির পাঁঠা করেছেন তাঁর দলের প্রধান সেনাপতি মুকুল রায়কে। দলের বৈঠকে তিনি বলেছেন, 'মুকুলের উচিত ছিল আন্নার বেইমানির খবর তাঁকে আগেভাগে জানানো।' পলাশীর ময়দানে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ডুবিয়েছিলেন তাঁর প্রধান সেনাপতি মিরজাফর। দিল্লীর রামলীলা ময়দানে বাংলার প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে একইভাবে ডুবিয়েছেন মুকুল।

ভোটের ঠিক আগেই দিল্লীর এই ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেসকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। এবার নির্বাচনে চিত্রতারকাদের

গূঢ়পুরুষের কলম

ভোটে প্রার্থী করায় জেলায় জেলায় তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে বিপুল ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। দলের জেলা নেতৃত্ব যাঁদের প্রার্থী হিসাবে চেয়েছিল তাঁদের বাতিল করে দিয়ে চিত্রতারকা, নাট্যকর্মী, গায়কদের ভোটের লড়াইতে নামিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং দলনেত্রী। তাঁরা রাগে ক্ষোভে ভিতরে ভিতরে ফুঁসছেন। তাঁদের ক্ষোভের যথেষ্ট কারণও আছে। সারা বছর তাঁরা দলের জন্য কাজ করেছেন। বিধানসভা থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলকে জিতিয়েছেন। এখন কলকাতা থেকে দিদির পছন্দের তারকাদের জেতানোর ফতোয়া অন্তর থেকে জেলার তৃণমূল কর্মীরা মেনে নিতে পারছেন না। রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ২৫টি আসনেই দিদি এবার বহিরাগত প্রার্থীদের টিকিট দিয়েছেন। দিদি তাঁর দলের বৈঠকে বলেছেন, 'জেলায় জেলায় প্রচার করবো আমি। আমার ডাকেই সাড়া দিয়ে ভোটাররা লক্ষাধিক ভোটের মার্জিনে তৃণমূল প্রার্থীদের কমপক্ষে ৩২টি আসনে জিতিয়ে দেবে। কথায় আছে, 'অতি দর্পে হত লঙ্কা'। দিল্লীর রামলীলা ময়দানে মুখে চুনকালি মেখে, বাংলা ও বাঙালির মান সম্মানকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েও দিদির শিক্ষা হয়নি। কিছু স্বার্থসর্বস্ব মানুষকে নোট ছড়িয়ে কেনা যায়। সবাইকে যায় না। গরিব মানুষেরও আত্মসম্মান বোধ থাকে। এই সত্যটি দিদি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে ভুলে গেছেন। ভোটের ফল গণনা হবে ১৬ মে। তখন দেখবেন, তৃণমূল কর্মীরাই দিদির পছন্দের প্রার্থীদের হারিয়ে দিয়েছেন।

তৃণমূল এবং বামফ্রন্টের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ মানুষ এবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র প্রতি আস্থা রেখেছেন। তাছাড়া মোদী ঝড়ের প্রভাব এই রাজ্যেও যথেষ্ট পড়েছে। গত ৮ মার্চ মধ্য কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছে। বাস পুড়েছে। সংবাদমাধ্যম ঘটনাটিকে আড়াল করেছে। দক্ষিণ ২৪-পরগণার ক্যানিং এলাকায় আগে দাঙ্গা হয়েছে। সজাগ সংবাদমাধ্যম সেবারেও সমস্ত ঘটনাকে চাপা দিয়েছিল। কোনও অজ্ঞাত কারণে কলকাতার সংবাদমাধ্যম এখন দলদাসদের মতোই আচরণ করছে। হয়তো বিধায়ক কেনার মতোই নগদ টাকার কারবার চলছে। কিন্তু মানুষ সব দেখছেন। খবর চাপা দিয়ে মানুষকে ধাপ্পা দেওয়া যায় না। কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে এবার জোর লড়াই হবে। কলকাতা উত্তরে রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি রাহুল সিন্হা এবং দক্ষিণে দলের প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায় এবার প্রার্থী। এঁদের পিছনে বিপুল জনসমর্থন ভয় পাইয়ে দিয়েছে অন্য সব দলকে। তৃণমূলের দিদি ভেবেছিলেন খুব সহজেই কলকাতার এই দু'টি আসন জেতা যাবে। কিন্তু তা হচ্ছে না। বিশেষত, উত্তর কলকাতা আসনটিতে জোর লড়াই হবে। এই আসনে তৃণমূলের কাঁটা হচ্ছেন সদ্য দলত্যাগী কংগ্রেস প্রার্থী সোমেন মিত্র। তিনি তাঁর জেতা আসন ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্র ছেড়ে উত্তর কলকাতায় প্রার্থী হয়েছেন শুধুমাত্র তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট কেটে হারাতে। সিপিএম প্রার্থী রূপা বাগচীর মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বাইরে পরিচিতি নেই। এই কেন্দ্রে রাহুলবাবুর জেতার সম্ভাবনা প্রবল। তাছাড়া এই কেন্দ্রের তৃণমূল কর্মীরাই বলছেন গত পাঁচ বছরে দলীয় সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁরা দেখেননি। তিনি দিল্লীতেই থেকেছেন। এমন অধরা সাংসদকে তৃণমূল কর্মীরাই চাইছেন না।

আর না হাজারে—এবার তোমার অরাজনীতির ভেক খুলে পড়েছে

এন. সি. দে

মনে পড়ে বছর দুয়েক আগের আন্নার অরাজনৈতিক দুর্নীতি- বিরোধী সামাজিক আন্দোলনের ঘটনাবলীর কথা? রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ছুঁৎমার্গী আন্না সেদিন বড় বেশি সচেতন ছিলেন তার দুর্নীতি- বিরোধী আন্দোলন যেন কোনোক্রমেই কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত না হয়। তাহলে তা নিশ্চিত ভাবেই একমাত্র জাতীয় দল বিজেপি-কেই সাহায্য করবে। সেই কারণেই তিনি অরাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের ভেক ধরেছিলেন। কোনও দলীয় পতাকা বহন তাঁর মঞ্চে নিষিদ্ধ করেছিলেন। তবু বাম-অবাম অনেক নেতাই সেদিন তাঁর মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি নেতারা তাঁর মঞ্চে যাওয়ার কথা বললেই তাঁর পাশের তৎকালীন অরাজনৈতিক ভেকধারীরা রে-রে করে উঠেছে। এই পত্রিকাতেই সেদিন আমি লিখেছিলাম এই দুর্নীতি-বিরোধী সামাজিক আন্দোলন আসলে কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক হাওয়া বিজেপি-র পাল থেকে কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজনৈতিক অনভিজ্ঞ বিজেপি নেতারা সেদিন না-বুঝে আন্নার আঁচেই হাওয়া দিয়েছে, তার ফলও তারা পেয়েছে ছয়টি রাজ্যের নির্বাচনে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। এক এক করে উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটক, পাঞ্জাবে বিজেপি গো-হারান হেরেছে। আন্না অসুস্থতার ভেক ধরে নির্বাচনের আগেই হাসপাতালে ঢুকে পড়েছে।

এ তাঁর রাজনৈতিক হাসপাতাল যাত্রা। কিন্তু কোথাও নির্বাচন আসন্ন হলেই আন্নার অরাজনৈতিক গান্ধী টুপিতে কংগ্রেসের হাওয়া লাগতে শুরু করে। তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন কংগ্রেসের ভরাডুবির আশঙ্কায়। দিল্লীসহ কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন এসে যাওয়ায় তিনি গোপনে বসে কংগ্রেসকে বাঁচানোর ছক কমতে শুরু করলেন এক নশ্বর চেলা কেজরিওয়ালকে নিয়ে। বললেন, কেজরিওয়াল আমার অরাজনীতির ভেক এখনই খুলে ফেলাটা ঠিক হবে না। তুমি বরং এখনই ওই টুপিটা পাল্টে ফেল। গড়ে তোল রাজনৈতিক দল, টাকার অভাব হবে না। কংগ্রেসই সব টাকার বন্দোবস্ত করে দেবে। তোমার কাজ কংগ্রেস-বিরোধী ভোট বিজেপি-র বাক্সে যেন না পড়ে, তা নিশ্চিত করা। কেজরিওয়াল 'ম্যায় আন্না হাজারে হুঁ' টুপি পাল্টে 'ম্যায় আম আদমি পার্টি হুঁ' লেখা টুপি পরতে শুরু করলেন। বানালেন 'আম আদমি পার্টি', দিল্লী রাজ্য ও ভারত রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেসের দুর্নীতিকে লঘু করার জন্য ক্ষমতাহীন বিরোধী দল বিজেপি-র বিরুদ্ধেও দুর্নীতির জিগির তুললেন। বিজেপি-র বাড়া ভাতে ছাই দিলেন কেজরিওয়াল, আন্নার গোপন গেম-প্ল্যান সফল হলো।

কোথাও নির্বাচন আসন্ন হলেই আন্নার অরাজনৈতিক গান্ধী টুপিতে কংগ্রেসের হাওয়া লাগতে শুরু করে। তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন কংগ্রেসের ভরাডুবির আশঙ্কায়।

১৯৪৭ সালের পর থেকেই কংগ্রেস দুর্নীতি বিকেন্দ্রীকরণ করেছে। কংগ্রেসের নীচের তলার নেতা ও মন্ত্রীদের দুর্নীতিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা কংগ্রেস সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদের দাবিদার না হতে পারে।

এটা করতে গিয়ে নেহরু-গান্ধী পরিবার কংগ্রেসকে দুর্নীতির গভীর খাতে নিক্ষেপ করেছে। আর্থিক ঘাটতি, রাজস্ব ঘাটতি, বাণিজ্য ঘাটতি ইত্যাদি সমস্ত ঘাটতি মেটানোর একটি পথই নিয়েছে এই কংগ্রেস সরকারও, সেটি হলো বিদেশী পুঁজি (এফ ডি আই/এফ আই আই)। এই বিদেশী পুঁজির

উপর অধিক নির্ভরতার ফলে দেশের আর্থিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। দেশের অর্থনীতি চলে গেছে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দেশীয় দালাল পুঁজিপতিদের হাতে। এরই পরিণামে দেশের শিল্প উৎপাদন তলানিতে ঠেকেছে। বেকারত্ব যেমন বাড়ছে, তেমনি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ছাঁটাই, লক-আউট ইত্যাদি কর্মচ্যুতি।

এইসব কারণে সারাদেশ জুড়ে আজ কংগ্রেস-বিরোধী হাওয়া প্রবল। এই হাওয়াকে অস্বীকার করার উপায় বা ক্ষমতা কংগ্রেসের নেই। উপায় বা ক্ষমতা নেই বলেই কংগ্রেস এই হাওয়াকে ঘুরিয়ে দেওয়ার নানান ফন্দিফিকির শুরু করে দিয়েছে। এই অপচেষ্টার অঙ্গ হিসেবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি কংগ্রেস-বিরোধী নানান ফ্রন্ট। কোনোটার আবার নাম আম-আদমি ফ্রন্ট। প্রতিটিরই লক্ষ্য জাত-পাত- গোষ্ঠীভুক্ত আঞ্চলিক ব্যক্তিতান্ত্রিক দলগুলিকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে দাঁড় করানো, এরা আপাতদৃষ্টিতে কংগ্রেস-বিরোধী মনে হলেও। ভোটের সময় কংগ্রেসকে গালমন্দ করে কংগ্রেস-বিরোধী ভোট কাটতে কিছুটা সক্ষম হলেও ভোটের পরে এরা কংগ্রেসকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার গড়তে সাহায্য করে। ২০০৪ সালে যেমন বামফ্রন্ট কংগ্রেসকে সরকার গড়তে সাহায্য করেছিল পরোক্ষভাবে, ২০০৯ সালে তেমনি তৃণমূল কংগ্রেসও কংগ্রেসকে সরকার গড়তে সাহায্য করেছিল প্রত্যক্ষভাবে। উভয়দলই কিন্তু একে অপরের ঘোরতর শত্রু। উভয়ই আবাবার তীব্র কংগ্রেস-বিরোধী। এ এক অদ্ভুত রাজনৈতিক সমীকরণ। এক কথায় নীতিহীন রাজনীতি, এরাই আবার নীতির বড় বড় বুলি আওড়ায়। বামুনের মেয়ে মুসলমানী সাজে, আবার কমিউনিস্ট হয়েও মুসলমান নেতা পার্টিতে মুসলিম সংরক্ষণ দাবি করে। এ জিনিস হিন্দুস্থানেই সম্ভব, কারণ হিন্দু এক আত্মবিস্মৃত, নিদ্রিত সম্প্রদায়, যারা নিজেরাই নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতিকে সাম্প্রদায়িক বলে নিন্দামন্দ করে এবং নিজেদের মধ্যে বিভেদ আনে।

একই চরিত্র আম-আদমি পার্টির। বিজেপি অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী হিন্দুত্ববাদীদের রুখে দেওয়াতেই এদের বেশি আনন্দ। শুধু বিজেপি বিরোধিতা করলে লোকে এদের উদ্দেশ্য ধরে ফেলতো, তাই দুর্নীতি প্রশ্নে কংগ্রেস-বিজেপি উভয় দলকেই আক্রমণ করছে যাতে কংগ্রেস-বিরোধী ভোট বিজেপি-র বাক্সে না ঢোকে। নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধী ভোট নিয়ে নির্বাচনের পরে সুযোগ মতো 'সাম্প্রদায়িক বিজেপি'কে রোখার নাম করে কংগ্রেস জোটে ভিড়ে যাওয়াই এদের আসল উদ্দেশ্য। যেমন দিল্লী রাজ্যে কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে এই দল সরকার গড়েছিল। লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেসের হাত ধরে থাকলে কংগ্রেস-বিরোধী ভোট শুধু বিজেপি পাবে তাই কংগ্রেস-লবির চাপে কেজরিওয়াল পুনরায় কংগ্রেস-বিজেপি-র বিরুদ্ধে তোপ দেগে রাস্তায় নেমেছে।

একটি কথা মানুষকে বুঝতে হবে যে কংগ্রেস এদেশের ৬৭ বছরের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মধ্যে প্রায় ৬০ বছরই ক্ষমতাসীন ছিল। গত ১০ বছর টানা ক্ষমতায় আছে কংগ্রেসই, বকলমে নেহরু-গান্ধী পরিবারই, অকাতরে বেপরোয়াভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থ, সম্পদ লুণ্ঠন করেছে এই দল, সীমাহীন দুর্নীতি করে চলেছে বছরের পর বছর ধরে। দুর্নীতি-প্রতিরোধের সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক বিভাগকে কাজে লাগিয়ে এইসব দুর্নীতিকে চাপা দিয়েছে।

অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাহীন বিজেপি-র বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে, যার কোনোটাই প্রমাণ করতে পারেনি। বিগত লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেসের মাস্টারস্ট্রোক 'তহলকা ডট কম'-এর পাণ্ডা তরুণ তেজপাল আজ পাপ স্খালন করছে জেলে বসে। কংগ্রেসের দুর্নীতির সঙ্গে বিজেপি-কে এক আসনে বসানোটা ছোট ছোট দলগুলোর বদমায়েশি কিছুই নয়।

তাই আজ বিজেপি-কে যদি জিততে হয় তাহলে ছোট ছোট আঞ্চলিক দলগুলোর বিরুদ্ধেও সমানভাবে লড়তে হবে। জনগণকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে হবে দুর্নীতিগ্রস্ত বিদেশী দালাল কংগ্রেসকে হারাতে গেলে শুধু বিজেপি-র মতো সর্বভারতীয় দলকেই ভোট দিন। লোকসভা ভোটে আঞ্চলিক দলকে ভোট দেওয়ার অর্থ দেশে সরকার গঠনে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা। এরা স্ব-স্ব রাজ্যে থাকুক, কারণ নিজ রাজ্যের বাইরে এদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। শুধু মমতার মুখে শুনি আমাদের দিল্লীতে ক্ষমতায় পাঠান, আমি রাজ্যের জন্য সবকিছু নিয়ে আসব। কথাটিতেই পরিষ্কার তার কোনও সারা ভারতের প্রতি দায়বদ্ধতা নেই। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ দেশী-বিদেশী কর্পোরেট হাউসগুলি এদের পিছনে টাকা ঢালছে কংগ্রেস বিরোধী ভোট যেন এককভাবে বিজেপি না পায়। একক সরকার গঠনে অচলাবস্থা সৃষ্টি হোক, এটাই কংগ্রেসের দেশী-বিদেশী প্রভুরা চান।

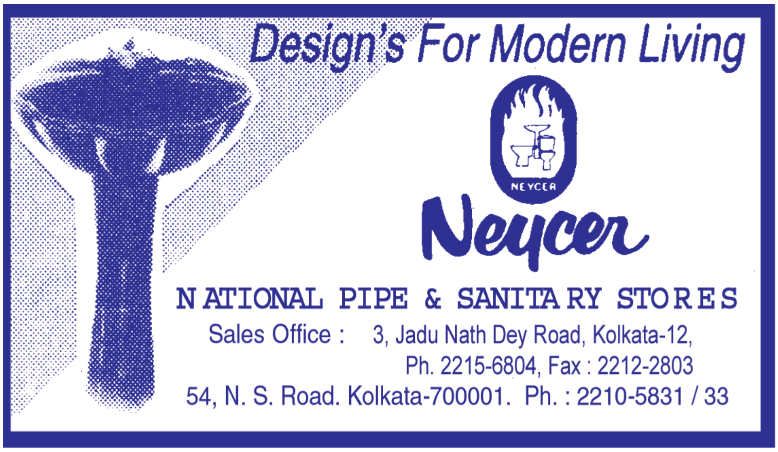

ডোনিগারের বই নিয়ে তথাকথিত প্রগতিশীলদের চূড়ান্ত নোংরামো

তথাকথিত প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নিজভূমেই হিন্দুত্বের লড়াই ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। ওয়েনডি ডোনিগারের 'দ্য হিন্দুজ : অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রি' বইটি এদেশের জনমানসে যে প্রবল ঘৃণা উদ্রেক করেছে তা বুঝেই বইটির প্রকাশক পেঙ্গুইন এর সমস্ত কপি বাজার থেকে তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এছাড়া এনিয়ে আইনি প্যাঁচেও তারা জর্জরিত হচ্ছিল। কিন্তু হিন্দু-বিরোধী তথাকথিত উদারপন্থীদের এতে আঁতে প্রচণ্ড ঘা লাগে। ভারতবর্ষে বাক্-স্বাধীনতা বিপন্ন ধুয়ো তুলে মাঠে নেমে পড়ে স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও উদারপন্থীরা। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এধরনের হিন্দু-বিদ্বেষী কিছু লোক জড়ো হয় দিল্লির প্রগতি ময়দানে। এরপর শুরু হয় চূড়ান্ত অসভ্যতা। পেঙ্গুইন ইন্ডিয়ার পুস্তক-বিপণির সামনে দাঁড়িয়ে তারা সমস্বরে হিন্দু-নিন্দাকারী 'দ্য হিন্দুজ : অ্যান অল্টারনেটিভ হিস্ট্রি' বইটি পড়তে শুরু করে দেয়। এতেই তারা থেমে থাকেনি। সঙ্গে বিলি হতে থাকে একটি প্রচারপত্র। যাতে দাবি করা হয় ওয়েনডি ডোনিগারের ওই বইটিতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনও 'কারণসম্মত অপরাধ' নেই এবং হিন্দুরা নাকি 'অপরীক্ষিত বিশ্বাসে' বিশ্বাসী। তাতে এও দাবি করা হয় যে বইপড়ার জন্য ওই সমাবেশ 'বাক্স্বাধীনতা ধ্বংসের বিরুদ্ধে সমস্বরে প্রতিবাদ' এবং 'প্রকাশকে'র সঙ্গে থাকার বার্তা। এমনকী এও বলা হয়েছিল যে তারা 'স্বাধীন ও নির্দল' কিন্তু স্থানীয় মানুষ অন্য কথা বলছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটেও 'নিষিদ্ধ বই পড়ো'-র বার্তা দেওয়া হচ্ছিল।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মূলত তিনজনের নেতৃত্বে এই অসভ্য আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল। এরা হলো বৃন্দা বোস, অমিত সেনগুপ্ত ও মানস রোশন। মানবতাবাদী আন্দোলনের নামে হিন্দু-ঘৃণাকারী হিসেবে এই তিনজনেরই দুর্নাম রয়েছে। এর মধ্যে মানস রোশন 'ক্যারাভান' ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত, যে পত্রিকায় 'অসীমানন্দ ও হিন্দু টেরর' শীর্ষক একটি বড়ো লেখায় হিন্দুদের অপদস্থ করার সঙ্গে চূড়ান্ত মিথ্যা দাবি করা হয় যে অসীমানন্দ নাকি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ১১৯ জন মানুষের হত্যার ঘটনায় আর এস এসের শীর্ষ নেতৃত্বের হাত ছিল। স্বভাবতই প্রগতি ময়দানে আয়োজিত এই নোংরামির রাশ কাদের হাতে ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তবে তথ্যাভিজ্ঞমহল এই ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক যোগও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। কারণ তথাকথিত প্রগতিশীলদের 'নিষিদ্ধ বই-পড়া'র তালিকায় 'রেড সারি' (Red Sari) নেই, যাতে সোনিয়া গান্ধীর জীবনের বিতর্কিত উপাখ্যান রয়েছে। এই তালিকায় নেই এস ও মাথাইয়ের 'রেমিনিসেন্সেস অব্ দি নেহরু এজ' বইটিও। এই বইয়ের 'শী' বলে একটি অধ্যায় রয়েছে যাতে নেহরু-কন্যা ইন্দিরার সঙ্গে তাঁর যৌন-সম্পর্কের কথা রয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করিয়ে দিতে চাইছেন, আজকের 'স্বাধীন মতামতে'র বুলি আওড়ানো 'মানবতাবাদী'দের দাপটেই এই বইগুলো ভারতীয় বাজারে টিকতে পারেনি। সুতরাং আজকের এই প্রতিবাদ যে কংগ্রেসেরই ভোট- স্বার্থবাহিত তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

প্রতিবাদের এই নাটক যখন দিল্লীর প্রগতি ময়দানে মঞ্চস্থ হচ্ছে তখন তার

প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন কিছু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী। যাঁরা হয়তো সেভাবে সঙ্ঘবদ্ধ ছিলেন না কিন্তু নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি তাঁদের চেনা চার দেওয়ালের স্বচ্ছন্দ জীবনের মধ্যে বসে থাকতে দেয়নি। এঁরা পড়াশুনো করেন মূলত আই আই টি, আই আই এম সি-র মতো দিল্লীর নামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে। এঁদের পাশাপাশি হিন্দু সেনা ও অন্যান্য সংগঠনের মানুষজনও এই অসভ্যতার প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন। এঁদের প্রতিবাদ ছিল শান্তিপূর্ণ, হাতে লেখা পোস্টার নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। অন্যদিকে সেই ‘প্রগতিশীল’রা ডোনিগারের সেই অংশগুলোই বারবার পড়ছিলেন যেখানে হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি অতি কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে। এর পাল্টা হিসেবে ওই মেধাবী প্রতিবাদকারীরা তাদের চুপ করতে বললেও কোনও লাভ হয়নি। আই প্যাড থেকে ‘বই পড়া’ চলতেই থাকে।

এদের অসভ্যতা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে বোঝা যায় একটু বাদে পুলিশ আসার পরে। যখন পুলিশকে বলা হয় এখানে ‘নিষিদ্ধ বই পড়া’র নামে ‘দ্য হিন্দুজ : অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রি’ পড়া হচ্ছে তখন ‘প্রগতিশীল’রা পুলিশকে দেখিয়ে অন্য বই যেমন প্রেমচাঁদ ইত্যাদি পড়তে শুরু করে। পুলিশ যাবার পরে ‘প্রগতিবাদী’রা বলে ‘হিন্দুদের পক্ষে বলার তোমরা কে?’ এদের পাল্টা বলা হয় ‘হিন্দুদের নিন্দা করারই-বা তোমরা কে?’ বলা বাহুল্য, হিন্দু-নিন্দুকদের হাতে নিগৃহীত হতে হয় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের। এখানেই উঠছে প্রশ্ন, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদের নিন্দা ও অপদস্থ করতে কোনও কর লাগে না, বরং হাজারো অনুদান পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে স্বধর্মকে বাঁচাতে যে হিন্দুরা এগিয়ে আসেন তাদের কপালে জোটে লাঞ্ছনা। বলা হয় তোমরা কি ধর্মের ঠেকা নিয়ে রেখেছো? এই অসভ্যতা রুখতে কিছু হিন্দু-নামধারীর হিন্দু-নিন্দা রুখতে বৃহত্তর হিন্দু সমাজকেই উদ্যোগী হতে হবে বলে মনে করছেন সমাজবিজ্ঞানীরা।

Sharada Travels

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ সূচী ২০১৪

ভ্রমণ	মুখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
কাশ্মীর	জম্মু, শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁও, বৈষ্ণোদেবী	১৩	১৭ই মে	১৪,৫০০/-
দার্জিলিং	টাইগার হিল, ঘুম মনেস্ট্রী, বাতাসী, মিরিক	৬	৩০শে মে	৬,০০০/-
সিমলা	সিমলা, কুফরি, মানালী, রোটাংপাস, কুলু, মনিকরন	১১	১৮ই মে	১১,২০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার-হৃষিকেশ, লক্ষ্মনঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরী	৮	২৭শে মে	৬,২০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর তিন মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস), বড়/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইট সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ,ডিনার (আমিষ/নিরামিষ),টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া,ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে,হাতি/ঘোড়া চাপা, পুজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

✷ ভ্রমণ শুরু ও শেষ, হাওড়া/শিয়ালদহ/ কোলকাতা অথবা উল্লেখ্য নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে ✷ হঠাৎ করে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি অথবা ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে প্যাকেজ মূল্য বর্ধিত হবে। ✷ বালক / বালিকাদের ক্ষেত্রে (৫-১১ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ৭৫% টাকা লাগবে। শিশুদের ক্ষেত্রে (২-৪ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ২৫% টাকা লাগবে।

‘দ্য হিন্দুজ : অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রি’

ইতিহাসের বিকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ওয়েনডি ডোনিগার ‘দ্য হিন্দুজ : অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রি’ নামে এক বিতর্কিত পুস্তক লিখেছেন যা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থা ‘পেঙ্গুইন’ প্রকাশ করেছে। এই পুস্তকে ইচ্ছাকৃতভাবে লেখিকা হিন্দু দেবী-দেবতার চরিত্র বিকৃত করেছেন। তাছাড়া বইয়ে অঙ্কিত ভারতের মানচিত্রে কাশ্মীরকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়েছে। ‘শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি’ এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করায় আদালতের নির্দেশে ‘পেঙ্গুইন প্রাইভেট লিমিটেড’ বাজার থেকে পুস্তকের সমস্ত কপি তুলে নেয় ও বিক্রি বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, আদালতের নির্দেশে সমস্ত বই নষ্ট করে দেওয়া হবে। দুঃখের বিষয়, এরূপ বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন লেখিকার সমর্থনে আমাদের দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী (অধিকাংশ বামপন্থী) তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে মাঠে নেমে পড়েছেন। এই বই-য়ে লেখিকার জঘন্য মানসিকতা নিচের কিছু অংশ থেকে স্পষ্ট হবে— বই-য়ের প্রচ্ছদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এক মহিলার নিতম্বে বসে থাকা ও নগ্ন মহিলারা ঘিরে রয়েছে— দেখানো হয়েছে।

১। ১৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, ‘‘হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির ভাবনার মূলে আছে কামুকতা। এখানকার সংস্কৃত সাহিত্য সেই কালখণ্ডে লেখা হয়েছিল যখন মহা যৌন উন্মুক্ততার কাল ছিল এবং আমি আমার রচনায় সেই অংশগুলিই কেন্দ্রে রেখেছি।’’

২। হিন্দুধর্মে ভগবান শিবের অমূর্ত চিহ্ন হলো লিঙ্গ কিন্তু লেখিকা লিঙ্গের ক্রিয়াত্মক কামোদ্দীপক বর্ণনা চিত্রিত করেছেন।

৩। ২৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, ‘‘হিন্দুদের কোনো মূল ধর্মগ্রন্থ নেই।’’

৪। ৬৬৭ পৃষ্ঠায় রামায়ণের কটু সমালোচনা করে লিখেছেন, ‘‘রামায়ণের রাজনৈতিক উপযোগ ভারতকে খৃস্টান, মুসলমান ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে মুক্ত করানোর জন্য করা হয়েছে।’’

৫। ১৪ পৃষ্ঠায় বাল্মীকি রামায়ণ উদ্ধৃতি করেছেন যাতে সীতা কামুকতার জন্য লক্ষ্মণকে অভিযুক্ত করছে। বাল্মীকি রামায়ণে কোথায় তা লেখা আছে তার উল্লেখ করেননি।

৬। ৩৬ পৃষ্ঠায় ওয়েনডি লিখেছেন, ‘‘প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ পড়ার অধিকার স্ত্রী-লোকদের ছিল না (বাস্তবে লেখিকার জানা নেই যে কমপক্ষে ঋগ্বেদের ২৯টি মন্ত্রে দ্রষ্টা নারীর উল্লেখ আছে)।

৭। পৃষ্ঠা ২৯৫-এ লিখেছেন, ‘‘সূর্যদেব কুন্তীর ওপর বলাৎকার করেছিলেন। যার ফলে কর্ণের জন্ম হয়েছিল এবং কুন্তী কর্ণকে ত্যাগ করেছিলেন।’’

৮। লেখিকা ‘রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গান্ধীজীর হত্যাকারী’ লিখে মূলত আদালতকে অপমান করেছেন। কেননা আদালত গান্ধী হত্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা ছিল না বলে রায় দিয়েছে।

৯। ৫৮৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন— ‘‘রানি লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজদের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন।’’

১০। ৫৭৯ পৃষ্ঠায়, ‘‘মঙ্গলপাণ্ডে ভাং, মদ ও আফিং-এ আসক্ত ছিলেন।’’

১১। ৬২৫ পৃষ্ঠায়, ‘‘গোমাংস ভক্ষণের বিষয়ে গান্ধীজীও দ্বিবিধ চিন্তা পোষণ করতেন।’’

১২। একই পৃষ্ঠায়, ‘‘গান্ধীজী এক বিচিত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করতেন।’’

১৩। ৬৩৯ পৃষ্ঠায়, ‘‘স্বামী বিবেকানন্দ লোকদের গোমাংস ভক্ষণের পরামর্শ দিতেন।’’

১৪। ‘‘বাঁদরকে (হনুমান) ভগবান মনে করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও ভারতীয় জনতাপার্টি তাদের দেবতা করে নিয়েছে।’’ (পৃ. ৬৬৩)

১৫। ‘বিবেকানন্দ বলতেন, আমাকে গোমাংস দাও।’ (পৃ. ৬৩৯)

১৬। ৬৬৪ পৃষ্ঠায়, ‘‘৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে ৫ লাখ লোকের এক উন্মত্ত ভিড় ‘মুসলমানদের হত্যা কর’-র মতো ধ্বনি দিচ্ছিল।’’

১৭। ৬৭২ পৃষ্ঠায়, ‘‘মহাভারত ভারতের এক মহান উপন্যাস মাত্র।’’

১৮। ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠায়, ‘‘যমী তার ভাই যমের সঙ্গে যৌনাচারের এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতো।’’

১৯। ‘‘বৈষ্ণব কবি জয়দেবের রাধা অত্যন্ত শক্তিশালী নারী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণে মাথা রেখে প্রণাম করতেন। এখানে উচ্ছৃঙ্খল প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমালাপ বা কামনার ফরাসী প্রবৃত্তি দেখা যায়।’’ (পৃষ্ঠা ৪৭৮-৭৯)

২০। ‘‘শিশু কৃষ্ণকে দেখাশুনা রাধার পক্ষে সমস্যাপূর্ণ হওয়ায় সে বহুদিন পর্যন্ত আনন্দপূর্বক কৃষ্ণকে ভালবাসতো।’’ (পৃষ্ঠা ৪৭৮-৭৯)

২১। লেখিকা এই বই-য়ে মুখ্যরূপে দেখিয়েছেন— ‘‘দশরথ নিশ্চিতরূপে কামুক প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর এই প্রবৃত্তির বিষয়ে রামও ভালভাবে জানতেন। বনবাসে যাওয়ার প্রাক্কালে লক্ষ্মণ দশরথকে ‘বৃদ্ধ বয়সে কামুক পুরুষ’ বলে গালি দিয়েছেন।’’

বস্তুত ওয়েনডি ডোনিগার এই পুস্তকে লেখকের স্বাধীনতার নামে নিজেরই কামাগ্নিকে উদ্দীপিত করে হিন্দু ও হিন্দুত্বকে বিকৃত করেছেন।

বাক্ স্বাধীনতার প্রবক্তাদের লক্ষ্য বিষয়ভিত্তিক : হিন্দুত্বের ওপর প্রণীত পুস্তক নিয়ে বিতর্ক

বলবীর পুঞ্জ

দোষটা আসলে ভারতীয় দণ্ডবিধির—মার্কিন লেখক ওয়েন্ডি ডোনিগারের প্রণীত পুস্তকের প্রকাশক পেঙ্গুইনের এমনটাই দাবি। ডোনিগারের প্রণীত পুস্তকের নাম 'দ্য হিন্দুজ : অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রি'। পুস্তকটি বাজার থেকে তুলে নেওয়ার স্পষ্ট কারণ দর্শানো সত্ত্বেও স্বাধীন যোদ্ধারা প্রকাশকের নিন্দা করছে এবং ভয় দেখিয়েছে। এছাড়া তাদের উষ্মা প্রকাশ করেছে তথাকথিত হিন্দু অধিকার নিয়েও।

এগুলি আসলে তাদের অন্ধ সমর্থনের প্রকাশ। বিস্ময়জনকভাবে এই নিরপেক্ষ বামেরা 'স্যাটানিক ভার্সেস' পুস্তকটিকে বে-আইনি ঘোষণা করার জন্য সরকারের ওপর চাপ বাড়িয়েছে, অথচ এরাই হায়দরাবাদে উত্তেজিত জনতা দ্বারা আক্রান্ত তসলীমা নাসরিনকে রক্ষা করতে তৎপর হয়নি। লেখিকার দোষ হলো তাঁর প্রণীত পুস্তকে ইসলাম বিরোধী কয়েকটি লাইন রয়েছে। কিংবা এরা তৎপর হয়নি যখন জোসেফ লেলিভেল্ডের পুস্তক বে-আইনি ঘোষিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে। 'দ্য গ্রেট সোল'-এ মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর বন্ধু হারমেন কালেন কাচের সম্পর্কের কথা রয়েছে।

কংগ্রেসের আরেক নিরপেক্ষ প্রবক্তা আইনবিদ অভিষেক মনু সিংভি আদালতে কেন দরবার করেছেন স্প্যানিশ লেখক জেভিয়ার মোরোর উপন্যাস 'দ্য রেড শাড়ি'-কে বে-আইনি ঘোষণা করতে? কারণ মোরোর ওই উপন্যাসে সোনিয়া গান্ধীকে নিয়ে লেখা রয়েছে। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ওই মতবাদ সত্যি, তবুও তা লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে না। কেন জওহরলাল নেহরুর তথাকথিত উদার অনুগামীরা তাদের নেতাদের নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রচনা লেখা বন্ধ করতে পারছেন না? কয়েক দশক আগে তাদের নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ওপর নির্মিত ব্যঙ্গাত্মক চলচ্চিত্রকে তারা নিশানা বানিয়েছিল। এরকম বহু নিদর্শন আছে যা বর্ণনা করলে দিস্তা দিস্তা পাতার অপচয় হবে যেখানে এই তথাকথিত উদার ও সেকুলারবাদীরা তাদের নেতাদের বিষয়ে লেখা পুস্তক পুড়িয়েছে।

যখন কলকাতায় তসলিমার এক অনুষ্ঠান

'দ্য হিন্দুজ : অ্যান অলটারনেটিভ হিস্ট্রি'র লেখিকা ওয়েণ্ডি ডোনিগার।

মুসলিম মৌলবাদীরা বানচাল করে দেয় তখন কোনও 'বাম বুদ্ধিজীবী' এবং 'তৃণমূলী উদার শিল্পীরা' তসলিমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি, উল্টে তৃণমূলী সরকার তাঁকে বিমানবন্দর থেকে ফিরে যেতে বলে। ডোনিগারকে নিয়ে তাদের হৃদয়ে এত রক্তক্ষরণ হচ্ছে যে তারা এ বিষয়ে এখন চুপচাপ। জয়পুরের কংগ্রেস সরকার এক নোংরা পন্থা অবলম্বন করে প্রখ্যাত লেখক সলমন রুশদিকে দু বছর আগে জয়পুরের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেয়নি। স্রেফ ইসলামী এবং সেকুলার অনুগামীরা 'স্যাটানিক ভার্সেস' পুস্তকটির প্রণেতাকে ওই অনুষ্ঠানে যোগদানে অনুমতি দেয়নি বলে। অথচ হঠাৎ-ই এইসব উদার এবং সেকুলাবাদীদের হৃদয় কাঁদতে থাকে যখনই তারা জানতে পারে যে, হিন্দুত্বের ওপর রচিত পুস্তকটি প্রকাশক বাজার থেকে তুলে নিয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। এক 'বাম উদারপন্থী' অন্য সেকুলারবাদীদের সঙ্গে একসুরে চিৎকার করতে থাকে যে দেশে বাকস্বাধীনতার কণ্ঠরোধ হচ্ছে এবং বাক্স্বাধীনতা বিপন্ন। কিন্তু তা কি সত্য? বইটি কি বে-আইনি বলে ঘোষিত হয়েছে নাকি কেউ কি তা চেয়েছে? সাদা সত্য হলো, শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন থেকে করা এক অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রকাশক বইটি তুলে নেয়। অভিযোগ ছিল যে, বইটি ত্রুটিপূর্ণ, সত্যের অপলাপ এবং বইটি ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু মানসে আঘাত করেছে। তার অর্থ এই নয় যে, তারা বইটি নিষিদ্ধ করতে বলেছে। প্রকাশক অনায়াসে এই অভিযোগ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারত। তারা এই অভিযোগ খণ্ডন করতে পারত বিভিন্ন যুক্তি সাজিয়ে। অভিযোগ ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা অনুসারে দায়ের করা হলেও এই মামলাটি চালানো যেত সংবিধানে বর্ণিত বাক্-স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়েছে বলে। তারা নানান ঐতিহাসিক প্রমাণ দাখিল করে অভিযোগকারীর সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করতে পারত এই অজুহাতে যে রামায়ণ হলো গল্প কাহিনী এবং হিন্দুত্ব যৌনত্বকে উপাসনা পদ্ধতিতে ব্যবহার করছে।

প্রকাশক কিন্তু বইটি নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছে তা নিয়ে জড়াতে চায়নি একদম। পেঙ্গুইন সংস্থাটি তার নিজের সমর্থনে বলেছে, "আমরা বিশ্বাস করি... যে ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং বিশেষত ওই বিধির ২৯৫-এ ধারা অনুসারে কোনো ভারতীয় প্রকাশকের পক্ষে আন্তর্জাতিক মানের বাক্-স্বাধীনতা অনুসারে কাজ করা খুবই দুরূহ যদি না সেই প্রকাশক নিজেকে আইনের বাইরে রাখতে চায়।"

এর সাবলীল অর্থ হলো পেঙ্গুইন সংস্থা হিসেবে ভীত হয়ে পড়েছে যেহেতু বইটি নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে। এই আইন মোতাবেক যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তবে সংস্থাটির কর্তাব্যক্তিরা ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। বিরোধীপক্ষ কেবলমাত্র বলছে যে বইটির কিয়দংশ ভারতীয় দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে যদিও পেঙ্গুইন সেরা আইনজীবী দ্বারা আদালতে জোরদার সওয়াল করতে পারত, তবুও আন্তর্জাতিক এই সংস্থাটি বইটি বাজার থেকে তুলে নেওয়াটাই ভালো বলে মনে করলো। সুতরাং এতে প্রমাণ হয়ে গেল যে, বাত্রার অভিযোগে সারবত্তা ছিল।

তথাকথিত বাকপটু উদারবাদীরা সম্ভবত জানেন না যে তারা যাকে হিন্দু অধিকার বলে গালমন্দ করে থাকে তারা জেনে নিক যে, বইটিতে এমন কিছু ছিল যা দেশের আইন-বিরোধী। সেক্ষেত্রে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য কেবল প্রকাশকই নয় সেই সঙ্গে ভারতীয় দণ্ডবিধি তথা উক্ত বিধির ২৯৫ ধারা। এরা কিন্তু ওই ২৯৫ ধারাকে কিছুই বলল না যখন ওই ধারা অনুসারে 'স্যাটানিক ভার্সেস'-কে বে-আইনি ঘোষণা করা হলো অথবা এরূপ অন্য অনেক বই। এরা কিন্তু আদালতে গেল না যখন তসলিমা কিংবা সলমন রুশদি আক্রান্ত হলেন, অথচ অন্য কেউ হলে এরা জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে ধারা ২৯৫-র বৈধতা নিয়ে আদলতে শোরগোল তুলত। হঠাৎ প্রকাশক যখন নিজেই হিন্দুর ওপর লেখা পুস্তকটি পরিমার্জনে ব্যস্ত হলো, নইলে আইনানুগ ব্যবস্থা হতে পারে— এই আশঙ্কায় তখন এই উদারপন্থীরা গেল গেল রবে চেঁচিয়ে উঠল— এরা কিন্তু প্রকাশকের উদ্দেশে কোনো শব্দ খরচ করল না, বরং হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো।

বইটির বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করায় আগে এবং লেখিকার দাবি নিয়ে কিছু বলার আগে আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে হিন্দুদের বহুত্ববাদ, সহিষ্ণুতা, হিন্দুধর্মের বিশাল ব্যাপ্তি, ঐতিহ্য এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে কিছু বলার জন্য তথাকথিত উদারপন্থীদের কিছু শেখার নেই। প্রকৃত অর্থে হিন্দু হলো বহুত্ববাদী ধর্ম যার প্রথম সত্য-ই হলো একমেবদ্বিতীয়ম্। পণ্ডিতরা অবশ্য বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা খুঁজবেন (একম্ সদ্, বিপ্রা বহুধা বদন্তি)। এটাই ভগবদ্ গীতায় বর্ণিত রয়েছে ঐশ্বরিক তত্ত্ব অখণ্ডিত। বিভিন্নরূপে তাকে দেখা যায়। যদি রামায়ণের তত্ত্ব বা বিশ্বাসের ওপর কেউ যদি আঘাত করে তবে তা নিয়ে কোনো মিছিল হবে না বা সম্পত্তি বিনাশ করবে না। কেননা এই মহাকাব্যের রচয়িতা নিজেই এর এক চরিত্র যিনি স্বয়ং নায়কের দেবত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমের দেশগুলির

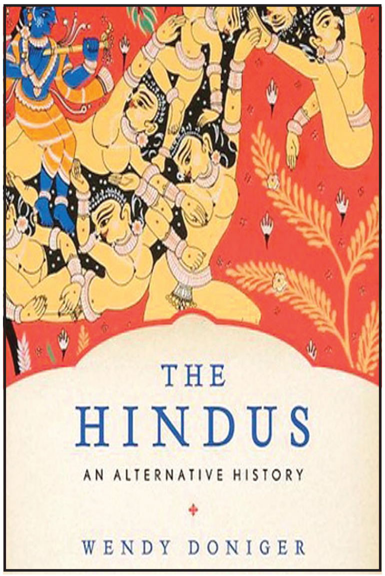

বিতর্কিত পুস্তক।

লম্বা ইতিহাস রয়েছে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার অথবা ধর্মীয় অবিশ্বাসীদের ওপর খাঁড়া নেমে আসার। হিন্দুসংস্কৃতি বৈদিক ঐতিহ্যে বিরুদ্ধাচারীদের সহ্য করেছে। গৌতম যিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন, বৌদ্ধত্ব প্রাপ্তের প্রথম দিন থেকে তিনি নিস্তরভাবে তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন অন্যদের।

নবম শতকে শঙ্করাচার্য যখন বৌদ্ধধর্মকে চ্যালেঞ্জ জানালেন তা হয়েছিল কেবল জ্ঞানের মাধ্যমে— শঙ্করাচার্যের এবং বৌদ্ধ দর্শনের মাধ্যমে। পশ্চিমে যে তিনটি ধর্মমত প্রসারলাভ করে তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য একে অপরকে হত্যা করতে লাগল। একপক্ষ নিজেদের সঠিক এবং অন্যপক্ষকে খারাপ বলে অভিহিত করতে লাগল। হিন্দু ভারত তাদেরই আশ্রয় দিয়েছিল এই ভূমিতে যারা নিজ নিজ দেশে নিপীড়িত হয়েছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য। ইহুদি, পারসি এবং অন্য অগণিত মানুষকে রক্ষা করেছে, আশ্রয় দিয়েছে এদেশের রাজারা। এসব ইতিহাসে বর্ণিত। কিন্তু যে মুহূর্তে অন্যধর্মাবলম্বীরা এদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ করল তারা এদেশের মানুষদের ধর্মান্তর করতে শুরু করল অথবা হিন্দু ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করল।

হিন্দুধর্ম ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক চিন্তায় বিভক্ত হলো যেমন অদ্বৈত, বিশিষ্ট অদ্বৈত এবং দ্বৈতবাদে এবং এই বাদগুলির বিশ্বাসীরা পরস্পর সহবস্থান করেই রইল। পাকিস্তানের দিকে তাকান। মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে পারবে না এই ছুতোয় পাকিস্তানের জন্ম। সেখানকার পেশোয়ার, করাচী কিংবা কোয়েট্টায় সুন্নিরা শিয়া মসজিদের ওপর দেদার আক্রমণ শানাচ্ছে এবং এর ঠিক উল্টোটাও ঘটছে— আর এক সম্প্রদায়ই অন্য সম্প্রদায়কে মুসলমান-বিরোধী বলছে। একই ঘটনা ঘটছে ইরানে। সেখানে শিয়া গোষ্ঠী বলবান, এরা সুন্নিদের শান্তিতে বাস করতে দিচ্ছে না। সৌদিতে সুন্নিরা নিজেদের সাচ্চা মুসলিম বলে জাহির করছে এবং এরা যাবতীয় সুখভোগ করছে এই একনায়কতান্ত্রিক দেশে।

এক সাহিত্য সমালোচক যিনি প্রকাশকের সমালোচনা করলেন তিনি হলেন অরুন্ধতী রায়। তিনি সংকেত দিলেন তাঁর কোনো পুস্তকই পেঙ্গুইন প্রকাশ করবে না। অবশ্য এ বিষয় কেউ তাঁকে প্রশ্নও করবে না। কিন্তু এই মিসেস রায়ই যিনি কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্য কেঁদে আকুল বিশেষত জিলানীর জন্য, যিনি কাশ্মীর ইস্যুতে সরকারকে তুলোধোনা করছেন, নকশালদের নিয়ে রোমান্টিকতায় মজেছেন, তিনি কিন্তু একটা শব্দও খরচ করেননি যখন জয়পুরে রুশদিকে সাহিত্য সম্মেলনে প্রবেশাধিকার দেওয়া হলো না। অথবা তসলিমাকে যখন হায়দরাবাদে হেনস্থা করা হলো এবং কলকাতা থেকে বের করে দেওয়া হলো। অরুন্ধতী বিচলিত বোধ করলেন যখন প্রকাশক হিন্দুত্বকে কালিমালিপ্ত করা পুস্তকটি বাজার থেকে তুলে নিল। বাছাই উদারপন্থা প্রকৃত অর্থে অর্ধ উদারপন্থীদের

অস্ত্র।

হিন্দুত্ব-র বদনাম করে লেখা এই বইটি নিয়ে এত চর্চা হোত না যদি বইটি শিক্ষা প্রদানের দৃষ্টিকোণ নিয়ে রচিত হোত। পুস্তকটির ত্রুটি হলো এই যে, একাধারে পুস্তকটি কিছু বাছাই করা বিষয় নিয়ে চর্চা করেছে, আবার অন্যত্র ধর্মকে কালিমালেপনের জন্য কিছু আজেবাজে বিষয় নিয়ে চর্চা করেছে এবং ধর্মাবলম্বীদেরও কালিমালেপন করেছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি চর্চার বিষয় হলো ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে এদেশের যৌনতাকে খোলাখুলি প্রচার করে। যে ধর্ম মানবিক যৌনতাকে অস্বীকার করে, সেই ধর্মে যারা প্রতিপালিত তারা যে কদর্যতার সঙ্গে এই যৌনতাকে উত্থাপন করেছে তা প্রকৃত অর্থে কু-রুচিপূর্ণ। পশ্চিমে লেডি চ্যাটারলির লেখক লেডি চ্যাটারলির প্রেমিককে জেলে পাঠিয়েছে আবার লেখক দাইনেবারের স্ত্রীকে সমকামী দেখিয়েছে, তাকে মহতী দেখানো হয়েছে।

ভারতে মানুষের যৌনতাকে গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়েছে। এইজন্য সাহিত্য, চারুকলা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে তার ব্যাখ্যা হয়েছে। এই কারণেই কামসূত্র সারা দুনিয়ায় যা প্রশংসিত সেই পুস্তকের লেখককে ঋষির সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে এবং এই পুস্তকের চিত্রগুলি ভাস্কর্যে স্থান করে নিয়েছে। ওয়েন্ডি ডোনিগারের মতো স্বল্পজ্ঞানী লেখিকা যখন হিন্দু এবং তাদের ধর্মে বর্ণিত যৌনতা নিয়ে, হিন্দু সাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অহেতুক চর্চা করেন তখন তো প্রকৃত চিন্তাবিদরা তাঁর প্রতিবাদ করবেই। অন্যত্র এই উদারপন্থীরা রুশদি ও তসলিমারা যখন আক্রান্ত হন তাঁদের রক্ষার্থে এগিয়ে আসে না অথবা 'দ্য রেড শাড়ি'-কে বে-আইনি ঘোষণা করতে তৎপর হয়। যৌনতা মানব জীবনের এক অঙ্গ এবং এই সত্যকে বিশ্ব দুয়ারে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঊনবিংশ শতকে কোনো ড. ফ্রয়েডের দরকার পড়েনি। আমাদের অতীতের প্রবক্তরা অনেক আগেই তা বলে গেছেন। এই সত্যকে সামনে আনার জন্য প্রকৃত সত্যান্বেষীরা অবশ্যই হিন্দুদের অভিনন্দন জানাবে কেননা অস্ট্রিয়ান মনোবিদ ড. ফ্রয়েডের বহু আগেই হিন্দুরাই এই সত্যকে আবিষ্কার করেছে।

এদিকে ডোনিগার এবং সমগ্র ইউরোপিয়ান লেখক-লেখিকারা হিন্দুত্বকে খাটো করে চেয়ারম্যানকে একরকম অভ্যেসে পরিণত করেছেন। সমস্ত রকমের অনুসন্ধান তা যতই কুরুচিকর হোক তা বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতাকে যথাযথ মর্যাদা দেবার জন্য স্বাগত। কিন্তু যখনই একপেশে ব্যক্তিরা অধ্যাপকের ভান করে সস্তার বই প্রকাশ করে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর অহেতুক কালিমালেপন করে তা অবশ্যই বিকৃত হবে। ডোনিগারের পুস্তকের মলাটের ওপর রয়েছে এরকম সস্তার প্রচ্ছদ। এই পুস্তকের মলাটে রয়েছে ওড়িশার এক মন্দিরের যৌনতাময় ছবি। এই পুস্তকের সমালোচক সঙ্গে সঙ্গে এই পুস্তকে থাকা অসত্য তথ্যের সমালোচনা করেছেন। যখন এরকম চর্চা চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ডিভিনিটি স্কুলের এক অধ্যাপকের কলম থেকে আসে যা মিথ্যা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন যে এই পুস্তকের পিছনে যুক্তিসম্মত কি জিজ্ঞাসা রয়েছে।

কিন্তু অসত্যকে হিন্দুত্বের প্রকৃত চিত্র হিসেবে তুলে ধরা হলো। বিষয়টিকে মিথ্যে প্রচার আর অন্ধ মনোবিকার হিসেবে খারিজ করা যায়। কিন্তু এই অপপ্রচার যদি এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রচারিত হয় যিনি এক নির্দিষ্ট ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি অনুগত, তবে তা অবশ্যই ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৫ ধারা অনুসারে অপরাধ বলে গণ্য হবে। ওইসব উদারপন্থীরা যদি এটাকে অপরাধ বলে মেনে নেয় তবে তারা নিজেদের বিশেষত মার্কিনিদের কাছে চর্চার বিষয় যারা হিন্দুধর্মকে সর্বদা হেনস্থা করছে। এমনকী দেড়শ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো শহরে ধর্মসংসদে হিন্দুত্বের বাণী প্রচারের উদাত্ত ব্যাখ্যা অন্যধর্মের প্রচারকে মলিন করে দিয়েছে।

মিসেস ডোনিগারের ডিভিনিটি স্কুলের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে পেঙ্গুইন সম্ভবত ডোনিগারের সততার দাবি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। তারই পরিণামে পুস্তকটি নিয়ে ভারতে যে প্রতিবাদ উঠেছে তা আর খারিজ করতে পারল না 'পেঙ্গুইন'। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষর বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ উঠেছে। আর এই অভিযোগ সাদা চামড়া দ্বারা তৈরি। ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলীদের মধ্যে একজনই কেবল কৃষ্ণাঙ্গ, যিনি নিজেই তার স্বজাতির বিরুদ্ধাচরণ করেন। আরেকজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি আছেন যিনি সেখানে একজন গবেষণা সহকারী, একমাত্র চীনা প্রতিনিধি রয়েছেন শিক্ষকমণ্ডলীতে যিনি সেখানে বিশ্বধর্ম নিয়ে গবেষণায় যুক্ত। আরেক শিক্ষক সোশাল মিডিয়া ওয়েবসাইটে প্যাথলজিস্ট হিসেবে পরিচিত এবং তিনি ধর্মসংক্রান্ত গবেষণার একজন অধিকর্তা। সুতরাং জাতিগত অন্ধবিশ্বাস পূর্ণ ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমগ্র শিক্ষকমণ্ডলী যা আমরা দেখছি।

ওয়েনডি ডোনিগার নিজে KIU KLUX klan গোষ্ঠীকে দান করেছেন বলে খবর রয়েছে। নিও নাজিমে ওয়েবসাইটে strom front-এ আলোচনা করত এবং অবাক হবার কিছু নেই সেই আলোচনায় ভারতীয়দের হীন চোখে দেখানোর লক্ষ্য বলে অভিযোগ। স্পষ্টত Microsoft Enciata নামে অধুনালুপ্ত এক পত্রিকাতেও ডোনিগারের বিরুদ্ধে হিন্দুদের খাটো করার বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডোনিগারের কলেজটি ইন্টারনেটে স্বাধীনতার বিষয়টি সত্যিই রসিকতার বিষয়। তিনি নিজে 'কমিটি অব সোশাল থটের' সদস্যা। স্পষ্টতই সংস্থাটি সর্বদাই মুক্ত চিন্তার বিপরীত পথে হাঁটে।

এই জাতীয় বিশ্বাসযোগ্যতা এবং অসত্যে ভরা নিয়ে রচিত পুস্তকটি বুদ্ধিজীবী মহলেও প্রশ্ন উঠিয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে, এই জাতীয় অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র হলো এই মিথ্যা প্রচারের পর্দা ফাঁস করা।

এমনকী এই পুস্তকটির বিরুদ্ধে আসরে নেমেছে স্বয়ং প্রকাশক। আমাদের উদারবাদীদের উচিত এগিয়ে এসে পুস্তকটির বিরুদ্ধে প্রচার করা এই বলে যে, পুস্তকটি বাক্-স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক। এটা শুনে আরও খুশি হবেন যে, আরেক প্রকাশক যারা হিন্দুধর্মকে খাটো করে এসেছে তারা হিন্দুদের দর্শন, ধর্ম, সঙ্গীত, যোগ, আয়ুর্বেদ নিয়ে প্রচার করায় পশ্চিমি দেশে বিশেষত আমেরিকায় অনেক হিন্দু তৈরি করেছে।

কেন নরেন্দ্র মোদী ?

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

আগামী লোকসভা নির্বাচন ৬৭ বছরের স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দেশের অর্থনীতি গভীর সংকটে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব দেশজুড়ে ভয়াবহ সংকট তৈরি করেছে। বিশ্বায়নের প্রভাবে ধুঁকছে ভারতীয় অর্থনীতি। শিল্প, কৃষিসহ নানা ক্ষেত্রে প্রচুর লগ্নি জরুরি। নানা ক্ষেত্রে লগ্নি, এমনকী বিদেশি লগ্নি এনে ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হবে। বিগত দশ বছর ইউপিএ শাসনে আর্থিক সংস্কার, উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি থমকে গেছে। তাই প্রথমেই ভারতীয় অর্থনীতির হাল ফেরাতে জরুরি স্পষ্ট ও দৃঢ় নীতি এবং তাকে রূপায়ণের জন্য চাই অবিচল রাজনৈতিক নেতৃত্ব। ইউপিএ ও এনডিএ-র অর্থনীতির মৌলিক নীতির মতপার্থক্য না থাকলেও, দেখা গেছে আর্থিক ও শিল্প সংস্কারে মনমোহিনী দাওয়াই তেমন কাজে আসেনি। ফলে মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনীতির বেহাল চিত্র উঠে এসেছে। দেশের বেহাল অর্থনীতিকে ফেরানোর পাশে রয়েছে দেশে আঞ্চলিক, ভাষা, ছোট রাজ্যের দাবি। রয়েছে সাম্প্রদায়িক সংঘাত, তার পাশে জেহাদি জঙ্গি ও মাওবাদী সমস্যা। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সমস্যাও বেড়েই চলেছে। এর পাশে প্রতিবেশীদেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে অবস্থানের প্রশ্ন।

দেশের মানুষের বড় অংশই মনে করছেন যে, নরেন্দ্র মোদীর সুনিপুণ নেতৃত্ব দেশের অভ্যন্তরীণ সামাজিক সংঘাতের পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি সমুহের সঙ্গে সফলভাবে মোকাবিলা সম্ভব। দেশের অভ্যন্তরে মুসলিমদের মতো জনজাতি ও দলিত হিন্দুদের নিয়ে নানা শক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজ করছে। এদের লক্ষ্য, একদিকে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত জিইয়ে রাখা, পাশাপাশি হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে নির্বাচনের রাজনীতিতে ফায়দা তোলা। নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে নির্বাচনের রাজনীতিতে ফায়দা তোলা। নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব হিন্দু সমাজকে ভাঙা ও দেশে ধর্মীয় সংঘাতকে কাজে লাগিয়ে কায়েমী স্বার্থের লক্ষ্যকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি দেশের সামাজিক, ধর্মীয় স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের ভূমিকা নিতে পারবে। মাওবাদের সমস্যা মূলত সামাজিক ও অর্থনীতি ভিত্তিক। মাওবাদীদের সশস্ত্র আন্দোলনের ধারা থেকে সরিয়ে তাদের দেশের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার বলিষ্ঠ নীতি নিতে হবে। একই ভাবে উত্তরপূর্বের নানা জঙ্গি গোষ্ঠী, যেমন— উলফা, এন ডি এফ বি, পি এল এ, এন এল এফটি, এ টি টি এফ, কে এল ও-সহ নানা ভারতীয় সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পাকগুপ্তচরচক্র আই এস আই ও বাংলাদেশের সামাজিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই-এর মদতে যে রাষ্ট্র-বিরোধী তৎপরতায় যুক্ত তার মূলকে উপড়ে ফেলতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব জরুরি। যদিও বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান করে আগেই ভারতকে অনেকটাই সাহায্য করেছেন। বহু জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব বিচ্ছিন্নতাবাদকে নির্মূলের পাশে, নাগাশক্তি আলোচনাকেও সফল করতে উদ্যোগ নেবার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব জরুরি।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশ সমস্যা ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, তৃণমূল কংগ্রেস কেউই এই ভয়াবহ সমস্যায় সমাধানে আগ্রহী নয়। উল্টে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী মুসলিমদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহারে আগ্রহী। এই মনোভাব উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে আরো ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করবে। অসম, ত্রিপুরা-সহ উত্তরপূর্বে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে চলে আসা হিন্দু বাঙালিদের নাগরিকত্বের সমস্যার সমাধান জরুরি। উত্তর-পূর্বের হিন্দু বাঙালিদের আশা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেই। এছাড়া ভারত জুড়ে চরম জেহাদি রাজনীতির প্রতিক্রিয়া আসছে পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তর-পূর্বে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে তসলিমা নাসরিনকে মৌলবাদী মুসলিমদের চাপে তাড়ানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস জামাতে ইসলামীর মতো ভয়ঙ্কর মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে আপোসের রাস্তা নেওয়ার রাজনীতি চালাচ্ছে। জেহাদি রাজনীতি ও উগ্রমুসলিম মৌলবাদীরা কোণঠাসা হতে পারে একমাত্র নরেন্দ্র মোদীর উত্তরণে। তাই নরমপন্থী মুসলিম রাজনীতির উত্তরণ জরুরি, তা সম্ভব হবে মৌলবাদী মুসলিমদের কোণঠাসার মাধ্যমে। দেশের মানুষ একারণেই মোদীর নেতৃত্বের দিকে ঝুঁকছে ও মনে করছে বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র মোদীই দেশকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

(লেখক সংবাদ সংস্থা এন এন এস-এর রাজনৈতিক সম্পাদক)

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার

প্রদীপ ঘোষ

ডাক্তার কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ারের জন্ম নাগপুরে কলিযুগের ৪৯৯১ বর্ষে চৈত্র শুক্ল প্রতিপদে, অর্থাৎ শক সম্বৎ ১৮১১ সালের প্রথম দিন। সেদিনটি শক আক্রমণকারীদের বিতাড়ন করে রাজা শালিবাহনের বিজয় উৎসবের দিন। এরূপ পবিত্র দিনে যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি যে ভবিষ্যতে বিশাল শক্তিশালী সমাজ গঠনের পথ দেখাবেন এতে আর আশ্চর্য কি। দিনটি ছিল ইংরাজি ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের ১ এপ্রিল।

কেশব ছিলেন জন্মজাত দেশপ্রেমিক। অতি শৈশবে রানি ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে আরোহণের ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে স্কুল থেকে দেওয়া মিষ্টি না খেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় ইংরেজ সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ক্লাসের মধ্যে বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করেছিলেন স্কুল পরিদর্শকের সামনেই এবং এজন্য স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েও নিজ সংকল্পে অবিচল ছিলেন। পরে যবতমলের রাষ্ট্রীয় বিদ্যাপীঠে পড়াশুনো করে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। এরপরে কলকাতায় এসে ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। পড়াশুনো ছাড়াও আরও একটি উদ্দেশ্যে কেশব কলকাতায় এসেছিলেন। বাংলা ছিল সেই সময়ের বিপ্লবের কেন্দ্রভূমি। বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। সেজন্য তিনি অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য হন এবং বিবিধ বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এই সময় তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'কোকেন'। ছাত্রাবস্থাতে তিনি বাংলায় বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশ নিতেন। যেমন বন্যাত্রাণ, কলেরা মহামারীতে সেবাকার্য করা ইত্যাদি। তিনি বরাবরই খেলাধুলাতে খুব পারদর্শী ছিলেন। তখন অখিল ভারতীয় স্তরে যে ভলিবল প্রতিযোগিতা হোত তাতে বঙ্গ প্রদেশের দলে তিনি অন্তর্ভুক্ত হতেন বলে জানা যায়।

ডাক্তারি পাশ করার পরে কেশব নাগপুরে ফিরে যান এবং অবিবাহিত থেকে দেশের কাজই করবেন এরূপ স্থির করেন। তখন কংগ্রেসের যে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল তাতে তিনি যোগ দেন এবং মধ্যপ্রদেশে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। একাধিকবার কারাবরণও করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সমাজের পরিস্থিতি সম্যক অনুধাবন করার পরে ডাক্তারজীর এই ধারণা হলো যে প্রচলিত পথে দেশের উদ্ধার হবে না। বিকল্প পথ চাই। সেই পন্থা অনুসন্ধানের প্রয়াসের মধ্য থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো আন্দোলনের সৃষ্টির কথা তাঁর চিন্তায় আসে। তিনি দেখলেন যে সকলেই মনে করছেন, ইংরেজদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেশকে স্বাধীন করতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু ভারতের ইতিহাস বলে যে এই দেশ বারবার বিদেশী বিধর্মী জাতির দ্বারা পরাস্ত ও পরাধীন হয়েছে। একথা ঠিক যে স্বাধীনতার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম হয়েছে, কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। এর কারণ আমাদের দেশবাসীর মধ্যে প্রকৃত জাতীয়তার অভাব ছিল। দেশপ্রেমের অভাব ছিল। যেজন্য দেশের এক অংশের ওপর আঘাত অন্য অংশের ওপরে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। সমগ্র দেশ এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে বহিঃশত্রুর মোকাবিলা করেনি। শুধু তাই নয়, জ্ঞাতি বিদ্বেষের জন্য অনেক সময় শত্রুকে সাহায্য করে ঘোর দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিয়েছে। অথচ এই দেশ একদিন জ্ঞানবিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছিল। পৃথিবীকে মানবতার পাঠ শিক্ষা দিয়েছে এদেশের বেদ উপনিষদ এবং বিভিন্ন দর্শনের অতুল জ্ঞানভাণ্ডারের মাধ্যমে। ধনরত্ন এখানে ছিল অফুরন্ত। যার লোভেই বারবার বিদেশী আক্রণকারীরা খাইবার গিরিপথ পার হয়ে ভারতে হানা দিয়েছে। অপরিসীম শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়ে অগণিত যোদ্ধা সংগ্রাম করেছেন, প্রাণবিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই প্রাচীন সুমহান জাতি পরাধীনতা, অত্যাচার ও অবমাননার দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে।

জাতির ইতিহাসের এই অধ্যয়নের মাধ্যমে ডাক্তারজী সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে প্রথমে এই ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করতে হবে। তার মধ্যে প্রখর স্বাভিমানবোধ, দেশপ্রেম ও আত্মবিশ্বাসকে জাগাতে হবে। রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই কাজ সম্ভব নয়। বিপরীত পক্ষে একথা বলা যায় যে জাগ্রত, চৈতন্যময় সমাজ যে কোনো কাজের মতো রাজনৈতিক আন্দোলনেও সফল হবে এবং স্বাধীনতা তখনই চিরস্থায়ী হবে। জীবনের অনেকগুলি বছর সক্রিয়ভাবে

রাজনীতি করার পরেও ডাক্তারজী তাই রাজনীতি থেকে দূরে সরে এসে সামাজিক সংগঠনের কাজে ব্রতী হলেন। বাস্তবিকই তিনি নিজ জীবনধারাই পালটে ফেললেন। আর কোনোদিনই রাজনীতিতে আসেননি তিনি। প্রশ্ন হলো, সংগঠন কাদের মধ্যে করতে হবে। তাঁর কার্যক্ষেত্র হিসেবে তিনি হিন্দুজাতিকে বেছে নিলেন। ভারতবর্ষের পরিচয় হিন্দুস্থান হিসেবে। এটাই হিন্দুদের আদি ও একমাত্র দেশ। ভারতবর্ষের যা কিছু সুমহান এবং গর্বের বস্তু তা সবই হিন্দু সমাজের দান। ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দুসভ্যতা সমার্থক। বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত জাতিরা এসে এই হিন্দুসভ্যতাতেই একীভূত হয়েছে। হিন্দু কোনো উপাসনা পদ্ধতি নয়, হিন্দু হলো জীবনধারা বা জাতীয়তা। হিন্দুর মধ্যে নানা উপাসনা পদ্ধতি আছে, সবটা নিয়েই হিন্দুত্ব। হিন্দু কি— এই সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

"হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী, অরণ্য-পর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাত পরম্পরার একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে অসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।"

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "তবে কি মুসলমান অথবা খৃস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রও নাই। হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দুখৃস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খৃস্টান। খৃস্টান তাঁহাদের রঙ, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু।" কয়েক বছর আগে একটি মামলায় রায়দান প্রসঙ্গে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিও বলেছিলেন যে হিন্দু কোনো সম্প্রদায় বিশেষ নয়। হিন্দুত্ব হচ্ছে way of life বা জীবন পদ্ধতি যা ভারতবর্ষের নিজস্ব এবং বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি বা সম্প্রদায় এর মধ্যে বিরাজ করছে।

ইতিহাস এই কথা বলে যে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও স্থায়িত্বের জন্য একতাবদ্ধ, বলশালী হিন্দুসমাজের প্রয়োজন। অতীতে আফগানিস্তান হিন্দুপ্রধান ছিল, হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসের ফলে আজ তা আমাদের হস্তচ্যুত হয়েছে। ১৯৪৭-এ ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ করে পাকিস্তানের গঠনও সেই একই ঘটনার পরিণাম। হিন্দুর দুর্বলতা সংখ্যাহ্রাসের ফলেই দেশবিভাগ এ সত্য তো অস্বীকার করা যাবে না। কোনো হিন্দু দেশবিভাগ চাইতে পারে না।

ডাক্তারজী যখন সঙ্ঘ স্থাপন করেন তখন হিন্দু সমাজে চরম দুর্বলতা ও আত্মবিস্মৃতি গ্রাস করেছে। নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতেও অনেকে লজ্জাবোধ করতেন। এমনকী জনৈক রাজনৈতিক নেতা বলেছিলেন যে, Call me an ass but don't call me Hindu'। সুকৌশলী ইংরাজ সরকার আমাদের দেশের নেতাদের বলল যে হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে মিলেমিশে স্বাধীনতার দাবি জানালে তারা ভারত ছেড়ে চলে যাবে। তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাদের ফাঁদে পা দিলেন এবং মুসলিম ভজনায় নামলেন যাতে তাদের সমর্থন পাওয়া যায়। তার বিষময় ফল দেখা দিল খিলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সুদূর তুরস্কে মুসলমান ধর্মগুরু খলিফাকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। তার প্রতিবাদে এই আন্দোলন। কিন্তু দেখা গেল যে তুরস্কের নেতা কামাল পাশা নিজেই খলিফাকে বিতাড়িত করে খিলাফতি সুলতানী শেষ করে দিলেন। এই ভাবে খিলাফত আন্দোলনের এক বিয়োগান্ত ও হাস্যকর পরিণতি হলো। মহাত্মা গান্ধীর একান্ত আগ্রহে কংগ্রেস খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল যাতে তার দ্বারা মুসলমানদের মন জয় করা যায়। সারাদেশে খিলাফত কমিটির জাল বিস্তৃত হলো। খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পরে দেশের নানা স্থানে তারা দাঙ্গা করল। যার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও শোচনীয় হলো কেরলের মোপলা আন্দোলন। নামে শাসকবিরোধী হলেও এই দাঙ্গা ছিল মূলত হিন্দুবিরোধী এবং বহু হিন্দুর প্রাণ, সম্পত্তিনাশ ও মহিলাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হলো। মহাত্মা গান্ধী কিন্তু এর প্রতিবাদ করেননি। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কল্পনায় নেতারা তখন এই রকমই বুঁদ হয়েছিলেন। প্রায়ই বলা হয় যে Hindu Muslim Unity at any cost (যে কোনো মূল্যে হিন্দু মুসলিম ঐক্য চাই)। এই আত্মঘাতী নীতির ফলেই পরবর্তীকালে দেশবিভাগ। এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে ডাক্তারজী দেশের এই অবস্থা অনুধাবন করলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে স্বাভিমান-শূন্য হতচেতন এই হিন্দুজাতিকে জাগ্রত করাই একমাত্র কর্তব্য। সেজন্য তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ঘোষণা করলেন 'হিন্দুত্বই রাষ্ট্রীয়ত্ব'। তাঁর এবং স্বয়ংসেবকদের নিরলস প্রয়াসে আজ সঙ্ঘ পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে পরিণত।

মানুষ-ডাক্তারজী সম্পর্কে দু' একটি কথা। এত বড় সংগঠক হয়েও তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ। কখনও ছবি তুলতে চাইতেন না। একবার জনৈক সাংবাদিক তাঁর নিষেধের পরোয়া না করে ক্যামেরার শাটার টিপে দেন। ডাক্তারজী দ্রুত হাতের ছাতাটি খুলে ধরলেন। কালো ছাতা ও সাদা ধুতির ছবি নিয়েই সে যাত্রা সাংবাদিক ফিরে গেলেন। ডাক্তারজী মালা কখনই পরতে চাইতেন না। পূজনীয় শ্রীগুরুজী একবার বলেছিলেন যে তিনি জীবদ্দশায় ডাক্তারজীকে কোনোদিন মালা পরাতে পারেননি, তাঁর শবদেহেই মালা দিতে পেরেছিলেন।

'সঙ্ঘ গঙ্গা বহ রহী হ্যায়
উস তপোধনকী অনোখী কীর্ত্তিগাথা কহ
রহী হ্যায়।'

(ডাক্তারজীর জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত)

তড়া আঁটপুরের শ্যামের পাট ও পরমেশ্বর দাস

উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তখন সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে অবস্থান করছেন। প্রভুপাদ নিত্যানন্দ ও অন্যান্য গৌরভক্ত রথযাত্রার পূর্বে বাংলা থেকে সেখানে যান। কিছুদিন শ্রীক্ষেত্রে থেকে জগন্নাথ দর্শন, গৌরহরির সঙ্গলাভ করে আবার বাংলায় ফিরে আসেন। যাঁরা বাংলা থেকে যেতেন তাঁদের মধ্যে পরমেশ্বর দাসও ছিলেন। পরমেশ্বর দাসের জন্ম বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে। বিয়ে করেছিলেন, দুই সন্তানও হয়েছিল, মতান্তরে অকৃতদার ছিলেন, সন্তান থাকার কথাও নয়।

একবার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে ডেকে বললেন--- প্রভুপাদ, তুমি গৌড়দেশে যাও। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মূর্খ, নীচ, দরিদ্রদের কৃষ্ণপ্রেমে ভাসাব। কিন্তু,

''তুমিও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি।।
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কে বা করিবে উদ্ধার।।''

মহাপ্রভুর আদেশে প্রভুপাদ নিত্যানন্দ তাঁর ছ'জন অন্তরঙ্গ পার্ষদকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গদেশে ফিরে এলেন। এই অন্তরঙ্গ পার্ষদদের অন্যতম পরমেশ্বর দাস। নিত্যানন্দ আচণ্ডালে কোল দিয়ে, হরি বলে, বাহু তুলে নেচে গেয়ে পতিত উদ্ধারে প্রাণমন সঁপে দিলেন; এই কাজে পরমেশ্বর দাস তাঁকে সাহায্য করেন। প্রেমধর্ম প্রচার ছাড়াও বিভিন্ন কাজে পরমেশ্বর দাস অগ্রণী ভূমিকা নেন। পানিহাটির দন্তমহোৎসবের দিনও নিত্যানন্দের সঙ্গে ছিলেন তিনি। প্রভুপাদের সঙ্গে বিভিন্ন তীর্থ পর্যটনে সামিল হন তিনি। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ যখন কালনায় সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীকে বিবাহ করেন, পরমেশ্বর সেই বিবাহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

পরমেশ্বর দাসের সমাধি

নিত্যানন্দের কাছে যেমন, ঠিক তেমনই জাহ্নবীদেবীরও খুব প্রিয়পাত্র হন পরমেশ্বর। নিত্যানন্দ ও জাহ্নবীদেবীর দাম্পত্য জীবনের প্রধান সেবকও পরমেশ্বর। খড়দহের শ্যামসুন্দরের বিগ্রহের নিত্য সেবাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁর। নিত্যানন্দ তাঁকে আদর করে 'পরমেশ্বরী' সম্বোধন করতেন।

তাই, জীবনীকারের কথা যথার্থ :
''নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বর দাস।
যাঁরার বিগ্রহে নিত্যানন্দ বিলাস।।''

১৫৩৩ খৃস্টাব্দে মহাপ্রভু তিরোহিত হন; তাঁর ন' বৎসর পরে ১৫৪২ খৃস্টাব্দে প্রভুপাদ নিত্যানন্দের তিরোধান ঘটে। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় নিত্যানন্দের তিরোধানও রহস্যময়।

নিত্যানন্দের অন্তর্ধানের পর জাহ্নবীদেবী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ পর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। গোষ্ঠী চালনার দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত হয়। তাঁর এই কাজে প্রধান সহায় হন পরমেশ্বর। মা জাহ্নবীদেবীর সঙ্গে বাংলা ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমায় অংশও নেন তিনি।

শ্রীবৃন্দাবনের বিখ্যাত শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে জাহ্নবীদেবীর ইচ্ছায় শ্রীমতী রাধারানির নতুন বিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করেন।

খড়দহে এক অনুষ্ঠানে সকলে পরমেশ্বর দাসের মধ্যে এক দিব্য বিভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করেন। আসলে, ভোজন চলাকালীন কলাপাতার অভাব ঘটে। খাদ্য প্রস্তুত। কিন্তু পর্যাপ্ত কলাপাতার অভাবে অনেকে বসতে পারছেন না। জাহ্নবীদেবী চিন্তায় পড়েন। পরমেশ্বর দাসকে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে বলেন। পরমেশ্বর দাস তৎক্ষণাৎ রওনা হলেন কলাপাতার খোঁজে। গঙ্গার এপারে পাতা নেই, পাতা আছে ওপারে। তখন পরমেশ্বর ''জয় নিত্যানন্দ বলি / গঙ্গাবঙ্গে যায় চলি।'' নিত্যানন্দের নামের মহিমায় গঙ্গা পার হয়ে গেলেন নৌকা ছাড়াই, ফিরেও এলেন নৌকা ছাড়াই, ''পত্র বোঝা লায়ে সাথে।''

জাহ্নবীদেবীর এবার আদেশ হলো : পরমেশ্বর, তুমি মূর্খ-নীচ- দরিদ্রদের মধ্যে প্রেমধর্ম, মহানাম প্রচার কর :

ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে।
শ্রীপরমেশ্বরী দাসে কহে ধীরে ধীরে।।
তড়া আঁটপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ।
তথা রাধা গোপীনাথ সেবা প্রকাশহ।।

হুগলী জেলার অন্যতম প্রাচীন জনপদ এই আঁটপুর গ্রাম। গ্রামের প্রাচীন নাম বিশাখালী বা বিশাখালা। একমতে, আটটি গ্রাম নিয়ে আঁটপুর। ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজার আট সেনাপতিও নাকি এখানে বাস করতেন। ভিন্ন মতে, ৫০০ বছর আগে বর্ধমান রাজার

নায়েব আঁটোর খাঁ আর তাঁর পুত্র আনোয়ার খাঁ এখানে শাসন চালাতেন। আঁটোর খাঁর নামেই স্থান নাম আঁটপুর। তড়া আঁটপুর আঁটপুর সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র জনপদ।

পরমেশ্বর দাস যখন তড়া আঁটপুরে এলেন, তখন, ''আঁটপুর গ্রাম, পাষণ্ডের ধাম।'' চারদিকে বিধর্মীদের বাস, মাঝে কয়েকঘর হিন্দুর সংকুচিত অবস্থান; সনাতন হিন্দুধর্মের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা। এমনই প্রতিকূল পরিবেশে পরমেশ্বর দাস এক পর্ণকুটির নির্মাণ করে প্রভুপাদ নিত্যানন্দসেবিত রাধা-গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। সাধন- ভজনের সঙ্গে চলল দীন হীন মানুষের মাঝে নাম প্রচার। ভিক্ষান্নে জীবন চলে; ভিক্ষান্নেই ঠাকুরের ভোগ, সেবা, পূজার্চনা। তাঁর নামগান কারও ভাল লাগে, কারও ভাল লাগে না, বিরক্ত হয়, ভাবে এ এক নতুন উপদ্রব। এই ভাবেই চলছিল।

গোপীনাথের পাশে রাধারানি, আর অপর পাশে বলরাম। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির পাশে অগ্রজ বলরামের অবস্থান তড়া আঁটপুরের 'শ্যামের পাট' ছাড়া অন্যত্র বিরল। আসলে রাধা আর গোপীনাথের মধ্যে পরমেশ্বর দাস 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত' গৌরাঙ্গকে আর বলরামের মধ্যে স্বীয় গুরু প্রাণপ্রভু নিত্যানন্দকে প্রত্যক্ষ করতেন। কারণ, নিত্যানন্দ স্বরূপত ব্রজের বলরাম, আর মহাজনদের মতে, পরমেশ্বর দাস শ্রীধাম বৃন্দাবনের অর্জুন সখা।

অর্জুন গোপাল বলি ব্রজে ছিল যিনি।
পরমেশ্বর ঠাকুর হইল এবে তিনি।।

এই ভাবেই পরমেশ্বরের মাধুকরীতে দিন কাটছিল। এ রকম-ই একদিন ভাবে তন্ময়, কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল, পরমেশ্বর চলেছেন হরিনাম, কৃষ্ণগুণগান গাইতে গাইতে। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে বুকভাঙা কান্নার শব্দে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, একমাত্র সন্তান সর্পাঘাতে মারা গেছে। তিনি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেন। বাড়ির লোকের অনুমতি নিয়ে ছেলেটির মাথায় হাত রেখে তাঁর প্রাণের দেবতা শ্রীনিতাই শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে কেঁদে প্রাণভিক্ষা করতে লাগলেন। এমনই আশ্চর্য বিষয় মৃত ছেলেটি প্রাণ পেয়ে উঠে বসল। এ যেন, 'নামের গুণে গহন বনে শুষ্ক তরু মঞ্জরে'-এর অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

ছেলেটির মা, বাবা, আত্মীয়স্বজন সাধকের চরণে লুটিয়ে পড়ল। বাকিদের মনও তাঁর প্রতি ভক্তিনত হলো। এই ঘটনায় সবার নজর পড়ল পরমেশ্বর দাস ও তাঁর আরাধ্য গোপীনাথের প্রতি। লোকমুখে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণের কাছে 'মরা বাঁচানো সাধু' বলে পরিচিত হলেন। গোপীনাথের পাতার কুটির পাকা হলো। স্থানটির নাম হলো 'শ্যামের পাট'। অনেকে পরমেশ্বরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। অনেকের আবার ঈর্ষাও হলো। তারা পরমেশ্বর দাসকে অপদস্থ করবার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির খুঁজতে লাগল।

একদিন পরমেশ্বর দাস বসে বসে ভক্তিবিভোর চিত্তে কৃষ্ণনাম কীর্তন করছেন। কয়েকজন মিলে একটি মরা শেয়াল পরমেশ্বরের কোলে ফেলে দিয়ে কৌতুক দেখার জন্য অদূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। পরমেশ্বর বাহ্য চেতনা ফিরে পেতে চক্রান্তটি বুঝতে পারলেন। কিন্তু পরমেশ্বরের স্পর্শে মরা শেয়াল প্রাণ পেল; শুধু তাই নয়, পরমেশ্বরের গানের ছন্দে ছন্দে নৃত্য করতে শুরু করে দিল। এতে দুর্বৃত্তরা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পরমেশ্বরের চরণে লুটিয়ে পড়ল।

পরমেশ্বরের নামে এরকম বেশ কিছু যোগবিভূতির কথা প্রচারিত আছে। এসব ঘটনার সত্য-মিথ্যা নিয়ে যাচাই করার জায়গা নেই; তবে একটা কথা-ই বলা যায়, ব্যক্তি স্বার্থে এসব বিভূতি তিনি দেখাতেন না, নাম প্রচারের জন্যই বিভূতির প্রকাশ ঘটে।

'মরা বাঁচানো সাধু' পরমেশ্বর দাস ও তাঁর পূজিত নিত্যানন্দসেবিত শ্যামসুন্দরের কথা ও মহিমা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জাহ্নবীদেবীও এই সময় একবার পরমেশ্বরকে দেখতে আসেন। মন্দির লাগোয়া একটি গৃহে কয়েকদিন অবস্থানও করেন। তিনি পরমেশ্বরকে নিত্যানন্দের ব্যবহৃত একটি 'খুন্তি' দান করেন। সেই 'খুন্তি' আজও সাদরে রক্ষিত আছে, কিন্তু পাঁচশো বছরের প্রাচীন 'খুন্তি', পাছে ভেঙে যায়, তাই বাইরে বের করা হয় না। শুধু জাহ্নবীদেবী নন, পরমেশ্বরের শ্যামের পাটে বহু বৈষ্ণব সাধক মহাজন বিভিন্ন সময়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কালনার ভগবান দাস বাবাজী, চরণদাস বাবাজী, রামদাস বাবাজীর মতো নমস্য ব্যক্তি এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এসেছেন।

বর্তমানে যে মন্দিরে শ্যামসুন্দর অবস্থান করছেন তা ১৬৯০-৯৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়। মন্দিরের সামনে নাটমঞ্চ, নাটমঞ্চের পাশে সুপ্রাচীন বকুল গাছ। জনশ্রুতি, পরমেশ্বর দাস এই বকুল গাছ লাগিয়েছিলেন, যা আজ বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। বকুল গাছের নীচে পরমেশ্বরের সমাধি। সময় বিশেষে, যা বকুল ফুলে ছেয়ে যায়।

মন্দিরের সেবায়েত, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব মানিকচাঁদ ঠাকুর জানান : শ্যামের পাটের যাবতীয় উৎসব ভক্ত ও শিষ্যদের দানেই সম্পন্ন হয়। প্রধান প্রধান বৈষ্ণব অনুষ্ঠান যেমন ঝুলন, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাস তো হয়-ই, অন্নকূট হয়। ভক্ত, শিষ্যগণ পাত পেড়ে অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করে। দোল উৎসবে শ্যামসুন্দরকে বাইরে আনা হয় বকুলতলায় পরমেশ্বরের সমাধির পাশে, নির্দিষ্ট বেদিতে। ভক্তরা সেদিন শ্যামের চরণ স্পর্শ করার অধিকার পায়। তারা শ্যামের চরণে আবির দেয়, সেই আবির কপালে নেয়। ভক্তসমাগমে নাম-গান, কীর্তনে শ্যামের পাট মধুময় হয়ে ওঠে।

পরমেশ্বর দাস সাধনার পাশাপাশি কিছু বৈষ্ণবপদও লিখেছিলেন। আসলে বৈষ্ণব সাধক মহাজনদের পক্ষে রাধাকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে পদ রচনা নিছক সাহিত্যসৃষ্টি নয়, তা সাধনার অঙ্গ। পরমেশ্বরের রচিত এরকমই একটি পদের কয়েকটি চরণ :

''প্রাণ মোর শ্রীগৌরাঙ্গ ধন মোর নিত্যানন্দ
তোঁহে বিনে গতি নাহি আর।
আছিনু বিষয়কীট বড়ই লাগিত মিঠ
ঘুচাইলে সব অহঙ্কার।।''

নবাঙ্কুর

ছোটোরা ছবি এঁকে ভরিয়ে দিলো দেওয়াল

কৌশিক গুহ

আগেই ঠিক হয়েছিল পাড়ার স্কুলের পাশে লম্বা-উঁচু দেওয়ালে ছোটোরা ছবি আঁকবে। রাজনৈতিক দলগুলো ওঁত পেতে ছিল। রঙ নিয়ে রাতারাতি দখল চিহ্ন দাগিয়ে দেবে। সেই সুযোগ পায়নি কোনো দল। চন্দন রায় বলেছিল, 'ছোটোরা দেয়াল জুড়ে ছবি আঁকবে। তাতে থাকবে প্রকৃতি মানুষ পশু পাখি। তার সঙ্গে লেখা হবে ছড়া কিংবা সরাসরি কয়েকটা কথা। স্লোগান বা পোস্টার নয়। সবাই মিলে কিছু ভাবা আর জনচেতনা জাগানো।' লম্বা এক টানা উঁচু দেয়াল। রাজনৈতিক দলগুলো এঁকে লিখে নোংরা করত আগে। তাদের মুছে দেওয়ার কথা বললে জানাত 'হ্যাঁ স্যার, এই সপ্তাহের মধ্যে মুছিয়ে দেবো।' কথায় আর কাজে যার যত বেশি অমিল সেই তত বড় নেতা। নেতা বলে যাওয়ার পর অনেক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। কোনো নেতার গরজ দেখা গেল না। চন্দন রায় বলল, 'নেতাদের উপর ভরসা না করে আমরা দেয়াল মুছে ভালো ভাবে যাতে লেখা যায় তার ব্যবস্থা করবো।'

একদিন সকালে ঠিক হলো ছেলের দল আসবে তাড়াতাড়ি। যারা আঁকবে তারা আগেভাগে তৈরি থাকবে। কি কি আঁকা হবে, ছবির মাধ্যমে কোন বার্তা উঠে আসে সেটা লক্ষ্য করতে হবে। জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর প্রণব লাহা আঁকার পর্ব সামলাবে। ভাবনা আঁকাজোকা সব ঠিক হয়েছিল আগেই। আঁকতে আর লিখতে খরচ হবে রঙ তুলি ইত্যাদি। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন কয়েকজন। যারা সকাল থেকে কাজ করবে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে টাকা দিয়েছিলেন ডাক্তার রাজর্ষি রায়। অন্যান্য খরচের জন্যেও আরও কিছু টাকা পাওয়া গেলো কয়েকজনের কাছে। রাজনীতিওয়ালারা দেয়াল দখল করে হাতের লেখা মকসোর সুযোগ না পাওয়ায় অনেকেই খুশি। তারা বলল, 'এতদিনে একটা ভালো কাজ হচ্ছে।' ভালো কাজ না খারাপ কাজ তার বিচার না করে সকলে মিলে লেগে পড়াটাই আসল।

ছোটোরা মোটামুটি ঠিক করেছিল কি কি তারা আঁকবে লিখবে। লেখার মধ্যে যাতে কোনো ভুল না থাকে সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন অজয়-স্যার। ঠিক হলো দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু লেখা যাবে। শুরু করাটাই আগে দরকার। চন্দন দুদিন আগে পুরো দেয়ালে সাদা রঙ করিয়ে রেখেছিল। একেবারে সাদাপাতার মতো ঝকঝকে। দেয়াল কুড়িটা অংশে ভাগ করে লাল চক দিয়ে দাগ কাটা ছিল। ঠিক হলো ছ-জনের একটা করে দল এক একটা ভাগে আঁকবে। দেয়ালের এক একটা অংশ লম্বায় পনেরো ফুট। উঁচু আট ফুট। নিচে এক ফুট আর উপরে একফুট জায়গা ছাড়া থাকবে। ছবির ফ্রেম বা জায়গা দাঁড়াল পনেরো ফুট × ছ'ফুট। পর পর ছবি থাকবে। প্রত্যেক দলের সঙ্গে তুলি রঙ ছাড়া অন্যান্য জিনিস রাখা। ছোট ছোট টুল ছাড়া বড় উঁচু টুল কয়েকটা রাখার কথা ভোলেনি চন্দন। ভাগাভাগি করে মিলেমিশে কাজ।

একসঙ্গে দেওয়াল চিত্রণের কাজ শুরু হলো। আঁকার দলে রয়েছে ১২০ জন। উৎসাহ দেওয়া আর দেখার জন্যে বেশ ভিড় হলো। তবে বলা ছিল দূর থেকে দেখতে হবে। সকলে কাছে যেতে চাইলে কাজের অসুবিধে হতে পারে। সকাল দশটায় আঁকা শুরু। একেক দল একেক রকম আঁকছে। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। অথচ মিল থাকবে প্রধান ভাবনায়। বেলা একটার মধ্যে অনেকটাই কাজ হলো। কতজন ছবি তুলছে। একটার সময় টিফিন হবে চন্দন-স্যার আগেই জানিয়েছিলেন। আঁকায় মেতে ওঠা ছেলেমেয়েরা কাজ বন্ধ করতে চাইছিল না। কিন্তু একটানা ওইভাবে কাজ করা যাবে না— এই নিয়মটা আগে থেকে ঠিক করা বলে মানল প্রত্যেকে। ভালো টিফিনের ব্যবস্থা ছিল। খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে নিলো সকলে। কাজ বন্ধ এক ঘণ্টার জন্যে। তারপর দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত শেষ পর্বের কাজ। নামকরা ভাস্কর মাধব ভট্টাচার্য পাড়ায় থাকেন। তিনি সকালে একবার এসে ঘুরে ঘুরে দেখে পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, 'বিকেলে আবার আসবো। শরীর ভালো থাকলে সারাক্ষণ বসে ছোটোদের আঁকা দেখতাম আর ওদের দেখতাম।'

দ্বিতীয় পর্বের কাজের সময় ছবিতে লেখাগুলো হলো। অজয়-স্যার দেখে দিয়েছিলেন বানান বাক্যগঠন ছন্দ। পাঁচটার

বই কথা কই

বিশ্ব জলদিবস ও আমরা

কুন্তক বলেছিল, 'প্রতিবছর ২২ মার্চ বিশ্ব জলদিবস হিসেবে পালন করা হয়।' জল কতটা জরুরি জিনিস তা আমরা বুঝি। কারণ জল ছাড়া একটা দিনও চলতে পারে না। একজন মানুষকে দিনে কমপক্ষে দু'তিন লিটার জল খেতে হয়। শরীরে জল কম পড়ে গেলে মুশকিল। অনেক সময় জল ঠিকমতো মেলে না। তখন খুব বুঝে জল ব্যবহার করা দরকার। যারা ফৌজে কাজ করে তাদের রপ্ত করতে হয় ওয়াটার ডিসিপ্লিন। জল আছে এক পাত্র। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক যদি জল ব্যবহারের নিয়ম না জানে তাহলে তেষ্টার সময় ঢক ঢক করে খেয়ে নেবে। তারপর আবার যখন তেষ্টা পাবে তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে? অভিজ্ঞ সৈনিক জল ব্যবহার করে ভেবেচিন্তে।

আমাদের কলকাতা মহানগরে অধিকাংশ মানুষই জল নিয়ে যথেচ্ছাচার চালায়। বিনা পয়সায় যথেষ্ট মেলে বলেই হয়তো ওইরকম অপব্যয়। তারা ভুলে যায়, এক লিটার জল তৈরি করতে কয়েক টাকা খরচ হয়। কলকাতা পুরসভা নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সকলের নাগালে জল পৌঁছে দিচ্ছে। আমরা একটুও সচেতন নই

বলে বিপুল পরিমাণ জল নষ্ট করছি। হঠাৎ কোনো কারণে পুরসভার জল সরবরাহে দেরি হলে লোকজন ছটফট করতে থাকে। আমাদের রাজ্যের অনেক জায়গায় খাওয়ার জল ঠিকমতো মেলে না— এটা কলকাতার বাসিন্দা বুঝতে চায় না জলের প্রাচুর্যের মধ্যে থাকার দরুন।

ভারতের অনেক প্রদেশে খাবার জলের তীব্র সংকট আছে। গরমের দিনে ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়। বহু জায়গায় মানুষ দূষিত জল খেতে বাধ্য হয়। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করছেন বারবার, 'জল নিয়ে যা খুশি করবেন না। আর কয়েক বছর বাদে পৃথিবীতে তীব্র জল সংকট দেখা দেবে। তখন জল নিয়ে দাঙ্গা মারপিট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।'

'জল নিয়ে আমাদের কিছু ভাবনা-চিন্তা পড়াশোনা দরকার। সেইসঙ্গে জনচেতনা জাগানোর জন্যে প্রচার করা চাই।' একথা কুন্তক বলল কয়েকজনকে। ওরা জল নিয়ে লেখা কয়েকটা বই জোগাড় করে ফেলল। বইগুলো পড়ে তৈরি করল একটা প্রচারপত্র। আর বেশ কিছু পোস্টার। জল দিবসের দিন পোস্টার টাঙিয়ে প্রচার শুরু করল লাইব্রেরির বারান্দায়। সব দেখে অনেকে বলল, 'এতো ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে।' লাইব্রেরিয়ান সুকেশ মণ্ডল বললেন, 'জল নিয়ে লেখা বেশ কিছু বই আমি আনার ব্যবস্থা করছি।'

বইমিত্র

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

আগেই কাজ শেষ হলো আঁকার। চন্দন একটা ছোট্ট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে রেখেছিল আগেই। মাধব ভট্টাচার্য বললেন, 'এমন চমৎকার কাজ করার জন্যে সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ছোটোদের বলছি অনেক বড়ো হও।' ডাক্তার রাজর্ষি রায় একটা বড় বইয়ের প্যাকেট গাড়ি থেকে নামাতে বললেন। চন্দন জানত না এটা। রাজর্ষি বললেন, 'মাধবদা, এদের প্রত্যেকের জন্যে একই বই একটা করে এনেছি। অবনীন্দ্রনাথের 'শিল্পায়ন'। আপনি সকলের হাতে তুলে দেবেন।' তাই হলো। পাঁচটা প্যাকেট বেশি। দেওয়া হলো পাঁচজনকে। চন্দন রায়, প্রণব লাহা জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় অজয় গুপ্ত আর হেডস্যার বিনায়ক চক্রবর্তীকে। আর একটা প্যাকেট বের করল রাজর্ষি। সেটা মাধব ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দিতে বলল হেড স্যারকে। প্যাকেটের মধ্যে রয়েছে অবনীন্দ্রনাথের 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী।' একটার পর একটা ছবি উঠতে লাগল। ছোট্ট শিল্পীদের আঁকা দেয়াল চিত্র আর তাদের ছবি তুলে নিল কতজন।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধ ভেঙে যাচ্ছে পরিবার

স্বাগতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমেরিকা ও চীনের মতোই এখন ভারতে বিবাহবিচ্ছেদ মারাত্মক ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এখনকার যুগে পাত্র-পাত্রী পারস্পরিক পছন্দের ভিত্তিতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। এই পছন্দের ভিত্তি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র সাময়িক আকর্ষণ, ধনসম্পদের লোভ। উচ্চপদাধিকারী সামাজিক মর্যাদা আছে এমন পাত্র কিংবা পয়সাওয়ালা পাত্রদের আজকাল মেয়েরা বেশি পছন্দ করে, অথচ পাত্র বা ছেলের স্বভাব-চরিত্র রুচি, সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা কতটা— এসব বিষয়ে মেয়েরা বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। ছেলেদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। তারাও পাত্রী বা মেয়ের স্বভাব-চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা, রুচিবোধ ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু বিয়ে তো আর ছেলে খেলা নয়। এটা একটা সামাজিক দায়িত্ব, একটি পরিবারের সঙ্গে অপর একটি পরিবারের মেলবন্ধন। একের প্রতি অন্যের দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার ও সুস্থ পরিবার গঠন করে সমাজে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু আজকের তরুণ-তরুণীরা দেশকাল, রুচি-সংস্কৃতি, চরিত্রের ধার ধারে না। স্বামী বিবেকানন্দ 'বর্তমান ভারত'-এ বলেছেন, ''ভারতীয় সমাজ কোনোদিন ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসকে সমর্থন করেনি। 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' এই ছিল ভারতের আদর্শ।'' ভারত তার নিজের আদর্শ থেকে আজ বিচ্যুত, তাই তার কুফল আজ সমাজ জীবন ভোগ করছে।

আধুনিক ভারতে দায়িত্বজ্ঞানহীন নরনারীর অবাধ মেলামেশা সমাজে

একদিকে যেমন যৌন বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচারের সৃষ্টি করছে অন্যদিকে তেমন পিতৃমাতৃ-পরিচয়হীন শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। এই সমুদয় শিশু শুধুমাত্র নরনারীর ভোগবাসনার ফল, যার কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। এই অবাঞ্ছিত শিশুরাই ভবিষ্যতে দুষ্কৃতী তৈরি হয় যাদের মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি হওয়ায় কোনো রাস্তাই থাকে না।

দায়িত্ববোধের অভাব থেকেই তৈরি হয় স্বামী-স্ত্রী মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের পরিবেশ। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে এমন ঘটনা ৩০ শতাংশ ঘটে মফস্‌সলে, ২০ শতাংশ ছোট শহরে এবং বড় শহরে তা প্রায় ৬৫ শতাংশ।

আই. টি. কর্মী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক বা মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানিতে কর্মরত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যেমন পারস্পরিক পছন্দের ভিত্তিতে বিয়ের পরিমাণ বাড়ছে, বিবাহবিচ্ছেদের পরিমাণও ঠিক ততটাই বাড়ছে। এই রোগে সবচাইতে বেশি আক্রান্ত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণী। নীচের তলার মানুষের জীবনযাপন যে খুব সুস্থ তা বলা যায় না। কারণ সেখানকার জীবনেও আজকাল এই অভিশাপ প্রবেশ করেছে, শুধু কাগজে কলমে হয় না এই যা। তার উপর অশিক্ষা, দারিদ্র্য তো রয়েছেই।

একদিকে বিদেশ থেকে আমদানি করা ভ্রান্ত নারীবাদ, বল্গাহীন নারী স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা, ব্যক্তিবাদ, ভোগবাদ, অন্যদিকে কুসংস্কার, প্রকৃত শিক্ষার অভাব— সব মিলিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে ভারতীয় মূল্যবোধকে। মনুষ্যত্ব, মানবতাবাদ, আত্মমর্যাদাবোধ ও মূল্যবোধ, লাম্পট্য, অবাধ যৌনতা, নেশা, মদ, জুয়া ও অর্থের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে সম্পর্কের পবিত্রতা।

ঋষি ও দেবতার পবিত্র এই ভারতভূমির অতীতের সব গৌরবকে বিসর্জন দিয়ে আমরা দৈন্য দশায় পর্যবসিত হয়েছি।

পারস্পরিক সুস্থ ভালোবাসা, যার ভিত্তি অবশ্যই উন্নত চরিত্র এবং মূল্যবোধ, তা আজ সমাজ থেকে প্রায় অদৃশ্য হয়েছে বলেই বিবাহবিচ্ছেদের সমস্যা এত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। আজ উন্নত চরিত্রের নারী-পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন, তা না হলে এই সমাজ ধ্বংস হবে। ফিরতে হবে অতীতের সেই মূল্যবোধে যখন ভারতীয় সমাজকে বিনম্রভাবে সবাই নমস্কার জানাতো। মনে রাখতে হবে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সেই বাক্য 'Back to the Basics' —তাহলেই আমরা আবার মাথা উঁচু করে বিশ্বের দরবারে দাঁড়াতে পারব।

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

মোদীর প্রচার অভিযানে চিরাচরিত মানসিকতা পরিবর্তনের ডাক দেওয়া জরুরি

১৯৫০ সালে হঠাৎ কুপিত জওহরলাল একবার বলেছিলেন, কলকাতা একটা মিছিলের শহর। সারা দেশবাসীর ভাবনা-কল্পনায় এই ছবিটিই এখনও বিরাজমান। একথা সত্যি এক সময়ে বৃটিশের রাজধানী অর্থনৈতিক দিক থেকে আজ তার কৌলিন্য অবশ্যই হারিয়েছে। বাজার অর্থনীতির রমরমায় যে আধুনিকতার বোলবোলা তার ধাক্কাতে খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে, তবে রাজনীতিমনস্কতার সঙ্গে তার যে নাড়ির টান তা কেউ ছেদ করতে পারেনি।

হালে ব্রিগেডে মমতাদেবী বিরাট জনসমুদ্র ডেকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার উচ্চাশা ব্যক্ত করেছেন। যে কোনো হিসেবে অনুযায়ীই কয়েক লক্ষ মানুষ তাঁকে সমর্থন করতে সেদিনও উপস্থিত হয়েছিল। এর পিঠোপিঠিই দীর্ঘদিন ক্ষমতাচ্যুত বামপন্থীরা অনেকটা স্মৃতিমেদুরতা থেকেই আর একটি ব্রিগেড সমাবেশের ডাক দেয়। অতীতের সেই টইটম্বুর সভাস্থল দেখার স্বপ্নই তাদের বর্তমানের একমাত্র সান্ত্বনা। অবশ্য সর্বপ্রথম তারা চেয়েছিল একেবারে প্রথমে হওয়া শ্রী নরেন্দ্রভাই মোদীর সমাবেশকে নিদেনপক্ষে টপকে যেতে।

মোদীর সমাবেশ ও শিক্ষা :

গত কয়েক মাসের মধ্যে পরপর পাটনা, গোরক্ষপুর, মিরাটের স্মরণীয় সভাগুলির তুলনায় মোদীর কলকাতার সভাকে অবশ্যই মাঝারি মাপের আখ্যা দিতে হবে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে তফাত ছিল। মনে রাখতে হবে, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে মোদীকে তাঁর সুনাম অনুযায়ী যথাযথভাবে তুলে ধরার মতো সাংগঠনিক শক্তি বিজেপি-র আছে। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে তো দলের কিছুই নেই। এখানে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জামানত জব্দ করাটা প্রার্থীদের জলভাত হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে অতিকায় ব্রিগেড প্যারেড মাঠের অধিকাংশ স্থান পূর্ণ করে ফেলাটা বিরাট সাফল্য। বিষয়টা আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে জনসমাগমের অন্তত ৪০ শতাংশ ছিল স্ব-ইচ্ছায় প্রবেশকারী।

মোদীর সভা থেকে একটা জিনিস অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল যে বিজেপি-র সংঘটিত সমর্থক ভিত্তির থেকে অনেক বেশি রয়েছে ব্যক্তি মোদীর প্রতি সমর্থন, শুভেচ্ছা ও সর্বোপরি উৎসুক্য। লক্ষ্য করতে হবে এই জনসমর্থন কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের জন্য। তাঁর কেরল, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যের সভাতেও এই একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই তিনটি রাজ্যে কেউই বিজেপি-কে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। তাহলে এই যে তিন রাজ্যের জনতা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মোদীকে অভিনন্দন জানাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে বা নিজেদের টিভির সামনে আবদ্ধ রয়েছে তারা কি ভোটের দিন জয়ললিতা বা মমতার প্রার্থীদের যথারীতি ভোট দিয়ে আসবে? কেননা বিজেপি-কে ভোট দিলে তা নষ্ট হয়।

মোদীর সভা থেকে একটা জিনিস অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল যে বিজেপি-র সংঘটিত সমর্থক ভিত্তির থেকে অনেক বেশি রয়েছে ব্যক্তি মোদীর প্রতি সমর্থন, শুভেচ্ছা ও সর্বোপরি উৎসুক্য। লক্ষ্য করতে হবে এই জনসমর্থন কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের জন্য।

প্রচার কৌশলে নতুন ভাবনা :

মোদীর প্রচার ম্যানেজারদের কাছে এটাই বড় চ্যালেঞ্জ। কি করে তারা পূর্ব ও দক্ষিণের কয়েকটি রাজ্যে সম্ভাব্য মোদী সমর্থকদের স্থানীয় নেতা-নেত্রীদের সমর্থন করায় অভ্যস্ত রাস্তা থেকে বেরিয়ে জাতীয় নেতা নির্বাচনের আলাদা পথ ধরাবে। তাদের রাজ্য ভোটার থেকে জাতীয় ভোটার করবে? মোদী তাঁর নিজের মতো করে রাজ্যে মমতার পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েও দিল্লীতে তাঁর নেতৃত্বে পরিবর্তন আনার আহ্বান রেখেছেন।

তাঁর কথা সোজাসাপটা, রাজ্য নির্বাচনে মমতাকে রাখুন কিন্তু দিল্লীতে তাঁকে আনলে রাজ্যের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে। নীতিগতভাবে ভোটাররা রাজ্যে একরকম দিল্লীতে ভিন্নরকম পছন্দের প্রার্থী বা দল বাছতেই পারেন। অতীতে এরকম উদাহরণ তো দেখাই গেছে। বিশেষ করে যখন ওজনদার কোনো নেতার উত্থান হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার হয়ে নির্বাচনে নামার কথা স্মরণে আসতে পারে। আবার যখন নির্বাচনের মাঠে কোনো ঢেউ আছড়ে পড়ে, মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় যেমন ১৯৮৪-তে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পরের নির্বাচনে হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ পুরো না হলেও এর আঁচ এড়াতে পারেনি। হাত-নাগাদ সীমিত পরিমণ্ডলে হলেও দিল্লীতে অতি সম্প্রতি আম-আদমি দলের ধূমকেতুর মতো উদয় আমরা দেখলাম। এদের প্রচার কিন্তু শুধুমাত্র সঠিক বার্তা দেওয়ার মধ্যে দিয়েই সফল হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ধারার প্রচার :

একটা কথা খুবই জরুরি। আসল সময়ে মোদীকে যদি তাঁর সম্ভাব্য খামখেয়ালি সহযোগী দলগুলির ওপর নির্ভরতা কমাতে হয় (যারা নির্বাচনে জেতা অবধি অপেক্ষা করছে) সেক্ষেত্রে বরাবরের প্রভাবহীন কয়েকটি রাজ্য থেকে দু' চারটে আসন অন্তত সংগ্রহ করতেই হবে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও বিজেপি-র তেমন প্রভাব নেই এমন রাজ্যগুলিতে মোদীর সভার সাফল্য দেখে এটা যে করা সম্ভব তা বলা যায়। তবে সেক্ষেত্রে বিজেপি-কে এই নির্বাচনটিকে আগাগোড়া ব্যক্তিনির্ভর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কায়দায় পরিচালিত করতে হবে (ওই প্রভাবহীন কয়েকটি রাজ্যে)। আর এই কাজ করতে গিয়ে তাই বিরাট কোনো দিগগজ প্রার্থী না হলেও চলবে। মোটামুটি স্বচ্ছ ব্যক্তিত্বই যথেষ্ট। শুধু পশ্চিমবাংলা আর তামিলনাড়ু ৪২ ও ৩৯টি আসনের প্রচারে ঘোষণা করতে হবে প্রার্থী একজনই তিনি নরেন্দ্র মোদী। এতে ফল মেলার সম্ভবনা প্রবল। প্রার্থীকে নয়, মোদীকে ভোট দিন উন্নয়নের পক্ষে, তিনি প্রমাণিত। অবশ্যই এটি চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচার, তাই বিশেষ কাম্য না হলেও মনে রাখতে হবে ২০১৪-তে মানুষ ভোট দেবে একটিই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য।

দুই মহামানবের মহাপ্রয়াণ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সভাপতি প্রবীণতম সন্ন্যাসী স্বামী গীতানন্দ মহারাজ প্রয়াত হলেন গত ১৪ মার্চ শুক্রবার সকাল ৯টা ১০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি স্বামী রামানন্দ মহারাজ গত ১৪ মার্চ শুক্রবারে বিকালে প্রয়াত হন সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় বালিগঞ্জে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। তিনি সঙ্ঘের সপ্তম সভাপতি ছিলেন।

দুই মহামানবের প্রতি রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার, গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063, Mobile : 9733387091

সাক্ষাৎকার : ডঃ কৃষ্ণগোপাল

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ডঃ কৃষ্ণগোপাল সংগঠনের কাজে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর ব্যস্ত কর্মসূচির ফাঁকে তিনি স্বস্তিকা-র প্রতিনিধিকে খানিকটা সময় দেন। তাঁর সেই একান্ত সাক্ষাৎকারটি এখানে প্রকাশ করা হলো।

□ **স্বামীজীর ১৫০ তম জন্মবর্ষ গেল। স্বয়ংসেবকরা সারা দেশে এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে কোনও প্রভাব ফেলতে পেরেছে কি?**

□ স্বামীজীর ১৫০ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন কার্যক্রম হয়েছে। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে যে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয় তাতে দেখা যায় এক লক্ষ যুবক অংশগ্রহণ করেছিল। এছাড়া বিভিন্ন কার্যক্রমে মহিলা ও জনজাতিদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার মতো। স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত গড়ার লক্ষ্য নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক কাজ করছে। তাই ভারতের সমস্ত গ্রাম-গঞ্জে-শহরে স্বামীজীর সেই বার্তা পৌঁছে দিয়েছে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করার জন্য স্বয়ংসেবকরা সংকল্প গ্রহণ করেছে। অধিষ্ঠান আর আত্মবিশ্বাস না থাকলে কোনো দেশ জাগ্রত হতে পারে না। তাই আমাদের অধিষ্ঠান আর আত্মবিশ্বাস ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

□ **আপনি দীর্ঘদিন উত্তর পূর্বাঞ্চলের কাজ দেখেছেন। গত বছরে কোকড়াঝাড়ে যে সংঘর্ষ হয়েছে তার ফলে বাংলাদেশীদের বিতাড়ন করা গেছে কি? অসমের হিন্দুরা কি কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পেরেছে?**

□ গত বছর কোকড়াঝাড়ে যে ঘটনা ঘটেছে এর পিছনে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের হাত আছে। বহুদিন থেকে বাংলাদেশী মুসলমানরা চক্রান্ত করে লক্ষাধিক মুসলমান অসমের মুক্তাঞ্চলগুলি দখল করে আছে নাশকতামূলক কাজ করার জন্য। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতে জোর করে নাগরিকত্ব নেওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু স্থানীয় মানুষ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারেরই অনুপ্রবেশকারীদের স্থায়ী সমাধান করার ইচ্ছা নেই। ভোটব্যাঙ্কের লোভে বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত কোনো সরকার নেয়নি।

□ **বাংলায় সঙ্ঘের কাজ অনেক পুরানো। ৭৫ বছর। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় সঙ্ঘের কাজের অবস্থান আপনি কেমন বলে মনে করেন?**

□ ৪০-৫০ বছর ধরে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ভুল চিন্তা-ভাবনা বাংলাকে নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সেই ভুলটা ভেঙে গেছে। সত্যের আভাস তাঁরা বুঝতে পারছেন। গত বছর ২০১৩ সালের ১১, ১২, ১৩ জানুয়ারি কল্যাণীর গয়েশপুর গোশালা ময়দানে ৫ ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত গড়তে ১০ হাজার যুবকের তিন দিনের শিবির হয়েছিল। বাংলার যুবকরা দেশভক্তিপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে তা দেখিয়ে দিয়েছে। গত ২৯-৩০ জানুয়ারি বেলুড় মঠে স্বামীজীর ১৫০তম জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে প্রায় ১২ হাজার যুবক স্বামীজীর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার জন্য একত্রিত হয়েছিলেন। যা বাংলাতে মার্কসবাদীদের দেখিয়ে দিয়েছে যে তাঁরা তাদের থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তা করছে।

□ **বিভিন্ন কার্যক্রমের চাপে সঙ্ঘের শাখার প্রতি দুর্লক্ষ্য করা হচ্ছে না কি?**

□ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন কোনো নতুন যুগ আসে পুরানো পদ্ধতি যথাযথ ভাবে চালানো অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। সঙ্ঘের শাখা হলো একটা মাধ্যম— শাখার মাধ্যমে স্বয়ংসেবক নির্মাণ হয়। সেই স্বয়ংসেবকরা সমাজজীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাবে এটাই ছিল কল্পনা। তাই স্বয়ংসেবকদের মাধ্যমে কোনো কিছু ভালো কাজ দেখার জন্য সমাজের মানুষ অপেক্ষা করে থাকে। শাখা থেকে নির্মিত স্বয়ংসেবক সমাজজীবনের বিভিন্ন সমস্যা দূর করার জন্য কাজ করছে। সমাজ জীবনে আগের থেকে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকার

জন্য সামান্য সময় বের করা খুব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কখনো কখনো এদের মনে হয় শাখায় গেলে অনেক সময় দিতে হয়, তাই অনেক সময় শাখাতে যাওয়ার জন্য আগ্রহ কমে যায়। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন কার্যক্রমের দ্বারা সংস্কার দেওয়া হয় যাতে আচার-আচরণে, ব্যবহারে শুদ্ধতা থাকে। দেশ ও সমাজ গঠনে নিজেদের অধিক সময় দেওয়ার জন্য যাতে মন তৈরি হয় সেই চেষ্টা করা হয়।

□ ২০১৪ লোকসভা নির্বাচন আসন্ন, এক্ষেত্রে সঙ্ঘের ভূমিকা কি? স্বয়ংসেবকরা এক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেবে?

□ আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে দেশে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কোনো রাজনৈতিক দল নয়। সেই কারণে সঙ্ঘ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। কিন্তু সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা নির্বাচনে মতামত দেওয়া ও ভালো-মন্দ বিচার করার কথা চিন্তা করবে। আমাদের বিশ্বাস সাধারণ মানুষ যোগ্য দলকেই কেন্দ্রে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেবে। স্বাধীনতার পর দেশ এখন ভয়ঙ্কর খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে শুধু তাই নয়, দেশে স্বাধীনতার পর গরিবের সংখ্যা আরো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিচ্ছে। এই সমস্ত সমস্যা কোন রাজনৈতিক দল ঠিক করতে পারবে সেটাও চিন্তা-ভাবনা করবে স্বয়ংসেবকরা। কোন রাজনৈতিক দল দেশের স্বার্থে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসবে এবং সেই সন্ত্রাসবাদীদের কারা সাহায্য করছে— স্বয়ংসেবকরা সেটাও বিচার করবে। এদেশে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হবে কি করে, বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশ কি করে বন্ধ করা যায়, দেশের স্বার্থে এদের সঙ্গে কোনো আপোস করবে না, এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এরকম স্বাভিমানী, জাতীয়তাবোধসম্পন্ন, ভেদাভেদ থেকে মুক্ত সশক্ত ভারত নির্মাণ করার জন্য কোন রাজনৈতিক দল ভালো ভূমিকা পালন করছে সেটাও তারা বিচার করবে।

□ বর্তমানে কিছু রাজনৈতিক দল মোদীকে কটাক্ষ করে বলছে যে তিনি হিন্দু-মুসলমানের কথা বলে ভেদাভেদ করতে চান— এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

□ মোদীর দল অর্থাৎ বিজেপির ব্যাপারে কিছু শ্রেণীর মানুষ তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ জানুয়ারি বিগ্রেডের সভাতে বলেছেন— মোদী নাকি শুধু হিন্দু-মুসলমান বলে ভেদাভেদ করতে চায়। কিন্তু ঘটনা হলো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সবসময় মুসলমানদের কথা বলছেন। যেমন— কিছুদিন আগে তিনি মৌলবীদের ভাতা দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বেসরকারি মাদ্রাসাকে সরকারি অন্তর্ভুক্ত করা, মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা করে শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ, চাকরিক্ষেত্রে সংরক্ষণ ও আরো কিছু প্রকল্প শুধু মুসলমানদের জন্য ঘোষণা করেছেন। এ রাজ্যে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা কি দোষ করল? মনে রাখতে হবে, মোদীর গুজরাট বাংলার তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। তাই গুজরাট সারা দেশের কাছে একটা মডেল রাজ্য।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com
web : www.calcuttawaterproofing.com

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS
4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

বঙ্গেশ্বরী কি ভারতীয় রাজনীতির ট্রোজান হর্স?

শ্রীচৈতন্য বর্ধন

ভোটযুদ্ধ শুরু হলো বলে। শিবিরে শিবিরে চলছে জোর প্রস্তুতি। বিপক্ষকে প্যাঁচে ফেলার নানা রকম কৌশল কসরতের জোর মহড়া। মহাভারতের আদি-সভা-বন-বিরাট পর্বের পর এখন উদ্যোগ পর্ব। সে উদ্যোগে কারো খামতি নেই। কেউ কারো চেয়ে কমতি যায় না। ডজনখানেক প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী জুটেছে। কেউ একা লড়ে প্রধানমন্ত্রী হতে চাইছে, কেউবা জোটবদ্ধ হয়ে লড়ে প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছে। সরকারি পুকুরে মাছ ধরার জন্য টিকিট কেটে যেমন মৎস্যশিকারীরা বঁড়শী ফেলে ফাৎনার দিকে চেয়ে থাকে— খুচরা দলগুলিও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে নতুন দল সংগ্রহে মেতে উঠেছে। তাতেও দেখা যাচ্ছে একদল ধরা দিচ্ছে তো দুই দল সট্‌কে পড়ছে। এই গোষ্ঠীতন্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য বিজেপি হঠাও কংগ্রেস বাঁচাও। আন্না হোক আর কেজরিওয়াল হোক বিজেপি-র পথে কাঁটা ছিটিয়ে বিজেপি-র মসৃণ পথ পিচ্ছিল করাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। শেয়ার বাজারের মতো রাজনীতির বাজারেও তেজি-মন্দি অবস্থা। গোপাল ভাঁড়ের গল্পের মতো এরা জোয়ারের বিষ্ঠা। কখন কার কোষায় উঠবে তা ভেবে পায় না। এদের পরিকল্পিত মহাজোট থেকে নবীন পট্টনায়ক, রামবিলাস পাসোয়ান, মায়াবতী, অসমের প্রফুল্ল মহন্ত আগেই গা ঢাকা দিয়েছে। শারদ পাওয়ারের এনসিপি এই ১১ দলীয় মহোৎসবে যোগদান করেনি। ফলে শুরুতেই বিসমিল্লায় গলদ দেখা দিয়েছে এবং তা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে তা অনস্বীকার্য। এরা মুখে বলে anti Congress এবং anti BJP Front, কিন্তু এদের কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে এটি পুরোপুরি anti BJP ও Pro-Congress Front (বা Fraud বলাই সঙ্গত)। এদের রক্তের বিশুদ্ধতা বলে কিছু নেই। যার তার সঙ্গে যখন তখন ঘর করতে এদের বাঁধে না। আর তা হবেই না কেন! প্রত্যেকটির গায়ে যে কংগ্রেসী বদরক্তের ধারা প্রবাহিত। সে রক্তের বন্ধন সাতপুরুষের আগে কি ছিন্ন করা যায়! তাই তো ভারতমাতা জ্ঞানে সোনিয়ামাতার পায়ে গড়াগড়ি দিতে এদের ইজ্জতে বাধে না।

সবার উপরে টেক্কা দিয়েছেন বঙ্গেশ্বরী মমতাজ বেগম। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হয়ে কখন যে কাকে কোল দিতেন তার যেমন ঠিকঠিকানা ছিল না, বঙ্গেশ্বরী কিন্তু তেমন ভাববিহ্বল নন। তার কোল কখনও শূন্য থাকে না; কারণ সে কোলে মুসলমান ছাড়া আর কারও ঠাঁই নেই। পশ্চিমবাংলাকে ইসলামী বাংলা বানানোই তার একমাত্র লক্ষ্য। বাংলাদেশে নিন্দিত ও ঘৃণিত ইসলামী ক্রিমিকীটগুলি তার কাছে আদরের দুলাল বলে সাদরে গৃহীত। সেদেশে হিন্দুদের জীবন অতিষ্ঠ করে তারা এদেশে এসে গ্রামে শহরে হিন্দুদের উপর নির্বিবাদে দৌরাত্ম্য চালিয়ে যাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা বরং বর্ডার পাস করেই ভোটার লিস্টে নাম ঢুকিয়ে উন্নয়নমূলক কাজের সিংহভাগ গায়েব করে নিচ্ছে। পুলিশ কোডে যতরকম দুষ্কর্ম আছে তার বেশিরভাগের সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী দুর্বৃত্তের দল। এরা এককালে ছিল সিপিএম আশ্রিত, এখন টিএমসি পোষিত। এদের গায়ে হাত দিয়ে পুলিশের প্রাণ গেছে— কিল-চড়-ঘুষি-লাথি তো হামেশাই তাদের কপালে জুটছে। কিন্তু তাদের লোম স্পর্শ করার সাহস নেই পুলিশের, কারণ বঙ্গেশ্বরীর পোষাবাহিনীর রোষানলে পড়লে আর রক্ষা নেই পুলিশের; চৌদ্দগোষ্ঠীর বাপান্ত করে ছাড়বেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে সর্বদিক দিয়ে অধঃপতনের অতল জলে ডুবিয়ে তিনি গেছেন ত্রিপুরায় এবং যথারীতি সে রাজ্যের আহাম্মক বঙ্গসন্তানেরা এবং অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা দল বেঁধে তার সভায় হাজির হয়েছে নেচে নেচে তার বক্তৃতা শোনার জন্য। জনসভায় লক্ষ লোকের সমাবেশ দেখে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তিনি গেছেন অসমে নরেন্দ্র মোদীর পেছনে পেছনে। কিন্তু ভোঁ ভাঁ— মেরেকেটে হাজার পনের লোক হয়েছে কিনা সন্দেহ--- যেহেতু তিনি অসমের সবচেয়ে বড় সমস্যা মুসলমান অনুপ্রবেশ সম্পর্কে স্পিকটি নট— কারণ তা হলে তার ভবিষ্যৎ জোটসঙ্গী আজমল মিঞা গোঁসা করবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বললে কংগ্রেস রাগ করবে। তাই বিচিত্রানুষ্ঠানের মঞ্চের মতো বক্তৃতা মঞ্চ তৈরি করে তার ওপর হেঁটে হেঁটে ঘুরে ফিরে যা নর্তনের ছোট সংস্করণ বলা যায়--- বিহু গান গাইলেন, নাটকীয় সংলাপ আওড়ালেন, শায়েরি ফোকলেন। নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের নিজের দেশে চালান দেবেন--- আর 'বাইদো' (অসমীয় দিদি) বললেন, ক্ষমতায় এলে তিনি অনুপ্রবেশকারীদের সসম্মানে বসবাসের ব্যবস্থা করবেন— যেমন করেছেন বাংলায়। সুতরাং জোরসে হাততালি পেলেন অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ থেকে এবং আতর বেচনেওলা আজমল মিঞার সঙ্গে নির্বাচন-পূর্ব দোস্তী পাতাবার ইচ্ছা পূরণের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেলেন। খাল কেটে কুমির ঢোকানোয় সিদ্ধহস্ত, চোরের জন্য ঘরের দুয়ার খোলা রাখায় অভ্যস্ত বঙ্গেশ্বরীর পাতা ফাঁদে অসমবাসী কতদূর সহ্য করবে তা দেখার আশায় থাকুন দেশবাসী। এই অগ্নিকন্যা বাংলাকে ছাই করেছেন— ত্রিপুরাতে হাত বাড়িয়েছেন, অসমে পদক্ষেপ করেছেন— এরপর নাকি সারা ভারত পরিভ্রমণ করবেন। ট্রয় নগরীকে ধ্বংস করতে যেমন ট্রোজান হর্সের ব্যবহার হয়েছিল— ভারতকে ধ্বংস করার জন্য ইসলামী জগৎ কি বঙ্গেশ্বরীকে ট্রোজান হর্স রূপে ব্যবহার করবে?

ধর্ম বনাম রিলিজিয়ন

অমলেশ মিশ্র

যে জীবন পদ্ধতি অপরের প্রতি হিংসা, দ্বেষ ও ঈর্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে জীবন পদ্ধতি জীব জগতের কল্যাণ করে না, ক্ষতি করে। মানুষ মাত্রেই তার জীবন পদ্ধতি একটি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করে। বিচার করা দরকার যে সেই 'বিশ্বাস' যার উপর ভিত্তি করে একটি মানুষ তার 'জীবন পদ্ধতি' পরিচালনা করছে, সেই 'বিশ্বাস' কতটা মানব কল্যাণমুখী।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে হিন্দু জীবন পদ্ধতি অবশ্যই এক অসামান্য উন্নত জীবন পদ্ধতি। এর মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নেই। হিন্দু জীবন পদ্ধতি পরিচালিত হয় এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, সকলে এখানে সুখী থাকুক, সকলে এখানে নীরোগ থাকুক, সকলের মঙ্গল হোক, কেউ যেন দুঃখভোগ না করে। সমগ্র জীবজগতের শুভ কামনায় নিজের জীবন নির্বাহ করতে হবে। এটিই মানবধর্ম বা মানবিকতা যা যুগযুগ ধরে হিন্দু দর্শন, হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু জীবন পদ্ধতি বলে চলেছে। সকলের অধিকার স্বীকার করে নিয়ে সকলের সঙ্গে সহযোগিতার এই জীবনাদর্শ অন্য কোথাও উপলব্ধ নয়। এই জীবনাদর্শের মধ্যে আছে বহুত্ববাদের স্বীকৃতি। যে বহুত্ববাদ অনেকেই স্বীকার করেন না। তাই দ্বন্দ্বটা তৈরি হয়েছে বহুত্ববাদিতা (Pluratism) এবং একত্ববাদিতার (monotheism) মধ্যে।

ঠিক এই বিরোধের কারণেই— 'সব ধর্মই এক' এই তত্ত্ব ঠিক নয়। যারা বহুত্ববাদিতায় বিশ্বাস করে না তাদের সঙ্গে একত্ববাদীদের মিলন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। আর দ্বন্দ্ব যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে একত্ববাদীদের সহিষ্ণুতার শিক্ষা নিতে হবে।

বহুত্ববাদী বলেন— আমি একত্ববাদে বিশ্বাস করি না কিন্তু যারা একত্ববাদে বিশ্বাস করেন তাদের আমি শত্রু মনে করি না। অপরদিকে একত্ববাদী বলেন, আমি বহুত্ববাদীতে বিশ্বাস করি না শুধু নয়, আমি একে সহ্য করব না, আমি একে বিনাশ করব। হয় তুমি আমার মতে আমার পথে এসো, না হয় আমার হাতেই মৃত্যুবরণ কর। আরও মজার বিষয় হলো— এক একত্ববাদি আবার অন্য একাত্ববাদীকেও স্বীকার করে না। ফলে, একত্ববাদীতার কারণে যেমন ধর্মান্তরকরণ হয়, একত্ববাদিতার কারণে দুই একত্ববাদীর মধ্যে যুদ্ধও হয়। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন, বহুত্ববাদিতায় বিশ্বাস করে বলে— দু'রকম একত্ববাদীকেই স্বীকার করে এবং সহিষ্ণু হয়। এই মৌলিক পার্থক্যের কারণেই 'সবধর্ম সমান, কথাটা অসত্য এবং অপ্রচলিত। এটি রাজনীতির ও ক্ষমতা দখলের প্রয়োজনে কিছু অজ্ঞান ব্যক্তির কল্পনা মাত্র। যুক্তি সিদ্ধ এবং প্রমাণিত নয়।

ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় কিছু কিছু শব্দ আছে সেগুলির ইংরাজি বা অন্যভাষায় যথার্থ বিকল্প শব্দ পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না কারণ, ওই বিশেষ শব্দটি যে বিশেষ অনুভূতি ও ব্যঞ্জনার দ্যোতক, সেই বিশেষ অনুভূতি ও ব্যঞ্জনা অন্যান্য ভাষাভাষি মানুষদের মধ্যে অনুপস্থিত। সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দটি যে অনুভূতি ও ব্যবহারের দ্যোতনা করে, ইংরাজি ভাষায় সেরকম কোনো সমার্থক শব্দ নেই। কিন্তু ইংরাজ পণ্ডিতরা Religion (রিলিজিয়ন) শব্দটি দিয়ে 'ধর্ম' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে প্রকাশ করলেন। কিন্তু 'ধর্ম' শব্দ ও রিলিজিয়ন শব্দ একই অনুভূতি ও একই ব্যবহারে প্রকাশ করে না।

আমাদের দেশে এমন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন যারা মনে করেন— (ক) সব ধর্মই এক, (খ) ধর্ম শব্দের ইংরেজি ভাষান্তর রিলিজিয়ন। উভয় ক্ষেত্রেই ওই পণ্ডিতরা ভুল করেন। সব ধর্ম যে এক নয় এ বিষয়ে অতি সামান্য আলোচনা করেছি। এখন ধর্ম এবং রিলিজিয়ন নিয়েও অতি সামান্য আলোচনা করছি।

'ধর্ম' ভাবের দশটি বৈশিষ্ট্য আছে— ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ। এইগুলির কোনো কোনোটি নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য এবং কোনো কোনোটি সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয়ের জন্য।

অপর দিকে 'রিলিজিয়ন' মাত্রেই তিনটি বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। একজন ঈশ্বর, একটি ধর্ম পুস্তক এবং একজন অবতার বা প্রবর্তক। 'ধর্ম' শব্দের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাস বাধ্যতামূলক নয়। অপর দিকে একটি বিশেষ নামযুক্ত ঈশ্বরে (গড/আল্লা) বিশ্বাস ব্যতিরিকে রিলিজিয়ন হতেই পারে না।

ধর্ম বহুত্ববাদিতা স্বীকার করে, সমস্ত মত ও বিশ্বাস সম্পর্কে সহিষ্ণু। আর রিলিজিয়ন— একত্ববাদিতায় বিশ্বাসী— আবার সেই 'এক'— যীশু অথবা আল্লাহ তা নিয়েও বিরোধ। অসহিষ্ণু। অন্যকে বিনাশ করতে বা ধর্মান্তরিত করতে বদ্ধপরিকর।

তাই ধর্ম শব্দটিকে যে কোনো ভাষাতেই ধর্ম (Dharma) হিসাবে উল্লেখ করা উচিত। ধর্মকে রিলিজিয়ন বলা ঠিক নয়। এতে ভাব ও ভাবনার অপপ্রয়োগ হয়।

জন্মসূত্রে মানুষ মাত্রেই হিন্দু-বহুত্ববাদী। পরে তাকে ব্যাপটাইজ (baptize) করে কোনো রিলিজিয়নে নেওয়া হয়— তখন সে হয় একেশ্বরবাদী। এবং একমাত্র তার ঈশ্বরই আসল ঈশ্বর, অন্য ঈশ্বর নকল। এবং তার কাজ হয় ধর্মান্তরকরণ।

পণ্ডিতমনস্করা এই সব সাধারণ পার্থক্যগুলিও গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। তার ফলে তারা যখন বলেন, সব ধর্মই এক, তখন তা আধ্যাত্মিক জগতে প্রযুক্ত হয় না, সস্তা রাজনীতির জগতে প্রযুক্ত হয়। 'সব ধর্মই সমান' বা এক-একটি রাজনৈতিক স্লোগান, বিভিন্ন রিলিজিয়নের মানুষদের কাছ থেকে ভোট আদায়ের একটি সুবিধাবাদী অস্ত্র মাত্র।

‘বেবী কর্ন’ গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রতি বছর জলস্তর নিচে নেমে যাওয়ায় গ্রামের কৃষকরা খুবই চিন্তিত ছিল। ধান ও গম চাষে প্রচুর জলের প্রয়োজন পড়ে। ঠিক এরকম সময়ে ‘বেবী কর্ন’-এর চাষ আশীর্বাদের মতো এসে গেল। আজ গ্রামের সমস্ত কৃষকের মুখে হাসি। গ্রামের যুবক- যুবতী ও মহিলাদের রোজগার বেড়েছে। কোনো কোনো কৃষক তো ব্যবসা করতেও শুরু করেছে। এই নতুন ফসল কৃষকদের পরিবারে এত স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে যে এই গ্রামকে লোকেরা আজ ‘বেবী করন্ গ্রাম’ নামেই ডাকতে অভ্যস্ত।

কৃষকদের মুখে হাসি ফোটানোর কারিগর হলেন হরিয়ানা রাজ্যের সোনাপতের কাছে অটেরনা গ্রামের ডাঃ সুরেন্দ্র কুমার চৌহান। ১৯৪৬ সালে তাঁর জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামেই হয়েছে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকের অভাব অনটন মনকে পীড়া দিত। জলস্তর ২০ মিটার থেকে ১০০ মিটার নিচে যেত। ধান গম চাষ বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এরকম অবস্থায় ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রামের কৃষকদের একত্রিত করে বেবী কর্ন চাষের কথা বলেন। কিন্তু লোকের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ থাকায় কেউ একটা রুচি দেখায়নি। তবু তাঁর উৎসাহে গ্রামের একজন কৃষক কম্বল সিং বেবী কর্নের চাষ শুরু করে। কম্বল সিং-এর সফলতা দেখে গ্রামের অন্য কৃষকরাও উৎসাহিত হয়ে বেবী কর্ন চাষ শুরু করে দেয়। এখন এই গ্রামের ১৩০০ পরিবারের সবাই বেবী কর্ন চাষ করছে।

অটেরনা গ্রামে সবুজ ফসলের মধ্যে গ্রামের কৃষকরা।

বাজারে বেবী কর্নের চাহিদা বাড়তে থাকায় গ্রামের কয়েকজন কৃষক চাষের সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবসা করতে শুরু করে। এর ফলে গ্রামের মহিলা ও যুবকরাও আয় করতে পারছে। গ্রামেই বেবী কর্ন সুন্দর কৌটা ও প্যাকেটে ভরার কাজ চলছে। যাদের জমি নেই তারাও খুব খুশি। কেননা তারাই এই ব্যবসা বেশি করছে। বেবী কর্নের চাষ ও আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানান জায়গা থেকে লোকের আনাগোনা বেড়ে গেছে। অন্য দেশের লোকও এই চাষ দেখার জন্য আসতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে নরওয়ের কৃষিমন্ত্রী ও জাপানের এক প্রতিনিধি দল এই গ্রামে এসে বেবী কর্নের চাষ ও ব্যবসা দেখে গেছে।

বেবী কর্ন চাষের বিশেষত্ব হলো, যেখানে অন্য ফসল বছরে দু’বার তোলা যায় সেখানে বেবী কর্ন তিন থেকে চারবার চাষ করা যায়। এক হেক্টর জমিতে প্রায় ১৪০০ কিলোগ্রাম বেবী কর্ন ও ৪০ টন গো-খাদ্য পাওয়া যায়। এর খরচ প্রায় ৩৪ হাজার ২০৫ টাকা। কিন্তু কৃষকের হাতে আসে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। একজন কৃষক বছরে ৩ বার চাষ করে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আয় করে। এজন্য খরচ হয় কেবল ১ লক্ষ ২ হাজার ৭৫ টাকা। যদি কৃষক বেশি জমিতে চাষ করতে পারে তো তার আয়ও সেই অনুপাতে বাড়বে।

বিভিন্ন ভিটামিন ও প্রোটিনে সমৃদ্ধ বেবী কর্ন চাষের জন্য কোনো রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োজন হয় না। জৈবিক সারই এর পক্ষে যথেষ্ট। সুপাচ্য হওয়ায় রোগী ও শিশুর পক্ষে খুবই উপকারী। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম আছে। মানুষের পক্ষে যেমন উপকারী, গবাদি পশুর পক্ষেও উপকারী। ফসল নেওয়ার পর এর ভুসি খাওয়ালে গাভী ২৫-৩০ শতাংশ বেশি দুধ দেয়। বেবী কর্ন চাষের কারণে অটেরনা গ্রামের সমস্ত কৃষকই খুব ধনী।

বেঙ্গল সামুই
ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ে
মাত্র দুই মিনিটে (ীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
মোবাইল -৯২৩২৪০৯০৮৫

"স্বদেশী-তপস্যা' ধর্ম কিনা এ বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে কি? অপরে যেন ভারত সম্বন্ধে অকারণ অনর্থক কথা না বলে। ভারতের সকল নরনারীর উপরই দেশের দরিদ্রদের সেবারূপ পবিত্র দায়িত্ব অর্পিত। 'নিজধর্ম পালন না করে অপরের ধর্ম অনুসরণ করতে গেলে ধ্বংস অনিবার্য'— গীতার এই সাবধান বাণী যেন সকলের মনে থাকে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

চিঠিপত্র

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি

দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম অপশাসনের বিরুদ্ধে আপনার খোলা তরবারির মতো বিরোধিতা দেখে পশ্চিমবঙ্গের ৪৬ শতাংশের ওপর মানুষ আপনার 'পরিবর্তনের' স্লোগানে নিজেদের ভাসিয়ে আপনাকে গদিতে বসিয়েছে। আপনি আগামী ২০১৬ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কাজের সুযোগ পাবেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, আপনি এখনও পর্যন্ত কি করেছেন? বাকি বছরে কী করবেন তার আভাস আমরা পেয়েছি।

প্রথমে জানাই এই আড়াই বছরে আপনার কাজের সাফল্যের খতিয়ান এখনও তৈরি হলো না, আর আপনি অরবিন্দ কেজরিওয়াল-এর মতো দিল্লীর মসনদ্ দখল করার কথা ভাবছেন। এটা কি একটু বাড়াবাড়ি হলো না? রাজ্যের মানুষকে আশাহত করা হলো না?

আপনি এখন আপনার বৈদেশিক নীতি কি হবে জানাননি। আমাদের পড়শী দেশ চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান এমনকী রাশিয়া, আমেরিকার সঙ্গে আপনার কূটনৈতিক অবস্থান কি হবে?

আপনার স্বরাষ্ট্রনীতি কি হবে? আপনার ভারতবর্ষের জন্য শিল্পনীতিই বা কি? পশ্চিমবঙ্গের জমিনীতির জন্য শিল্পব্যবস্থা আজ কোথায় চলে যাচ্ছে। শিক্ষিত নথিভুক্ত বেকার আজ এক কোটির ওপর। একই অবস্থান কি ভারতের জন্যও ভেবে রেখেছেন? আপনি যেভাবে একা নিজের ছবি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আকাশ বাতাস ঢেকে সরকার চালাচ্ছেন যা সাধারণত একনায়কতন্ত্রে দেখা যায় এবং আপনার অন্যান্য মন্ত্রী পারিষদকে অযৌক্তিক করে রেখেছেন, সেই ভাবে কেন্দ্রে কংগ্রেসও ইউপিএ-এর বর্মের আড়ালে এক ব্যক্তি বা একটি পরিবারের পদলেহন করে দীর্ঘ ৬০ বছর সংবিধানের গণতন্ত্র নামক শব্দটিকে কবরে পাঠিয়ে আজ পুরো ভারতবর্ষের জন্য ওরা কবর খুঁড়ে রেখেছে। তাহলে আমি বিনয়ের সঙ্গে আপনার নিকট এই প্রশ্ন রাখছি যে ভারতের মানুষ আপনার দলকে বা আপনাকে কি যুক্তিতে কংগ্রেসের পরিবর্তন হিসাবে ভাববে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যারা আপনাকে, আপনার বিরোধী নেতৃত্ব দেখে জয়ী করে এনেছেন তাঁরা কি 'সিমি' নামক নিষিদ্ধ সংগঠনকে সমর্থন করেন? যারা বাংলাদেশে জামাতে ইসলাম-এর সঙ্গে বিএনপির যোগ-সাজসে লক্ষ লক্ষ বাঙালি মুসলিম ভাই-বোনেদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদেরও হত্যা করছে, ধর্ষণ করছে, যারা শোনা যাচ্ছে আলকায়দার সঙ্গী, যাদের টাকার যোগান দিচ্ছে ইসলামিক ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্ক, সেই জামাতের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি-ও ওই আহমেদ হাসান ইমরান যিনি ব্যাঙ্কের পদস্থ ব্যক্তি এবং সর্বোপরি 'কলম' নামক এই পত্রিকা যারা ইসলামি জেহাদির মন্ত্রে বাঙালি মুসলমানদের পশ্চিমবঙ্গে দীক্ষিত করতে চাইছে সেই কাগজের সম্পাদক আহমেদ হাসান ইমরানকে আপনি অনেক লড়ে বিরোধী দলের নেতাদের বিধায়কদের ভাঙিয়ে ভোটে জিতিয়ে রাজ্যসভায় পাঠালেন। এটা কোন তাগিদে-- রাজ্যসভাকে আরো অলংকৃত করার জন্য নাকি আপনার মুসলিম ভোটব্যাঙ্ককে সংগঠিত করার জন্য। রাষ্ট্রদ্রোহী একটি দলের প্রধানকে আপনার এই আনুকূল্য কি পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ এমনকী বাঙালি ও অন্যান্য মুসলিম সমাজ ভালো চোখে দেখছে? রাজ্যের আইনব্যবস্থাকে কার্যে রূপায়ণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অর্থাৎ আপনার পুলিশবাহিনী। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্রে আছে এইজন্য যে সাধারণ নাগরিকের জীবনধারণের সমস্ত ব্যবস্থা ও অধিকার যাতে প্রাপ্ত হয়। নির্ভয়ে পুরুষ থেকে নারী ও শিশুরা রাজ্যে বসবাস করতে পারে। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনে যে গণতন্ত্র ভারতের সংবিধানের বাইরে গিয়ে দলীয় সংবিধানের দাসত্ব করছিল তার বিরুদ্ধেই ছিল আপনার ও আপনার দলের জেহাদ। আজ পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনগণ এমনকী আপনার দলের শুভাকাঙ্ক্ষীরাও দেখছে যে দুষ্কৃতীরা এত বেপরোয়া হয়ে গেছে যে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, তোলাবাজী, খুন, অপহরণ আজ খবরের কাগজে প্রতিদিনের শিরোনাম। রাজ্যে বেআইনি চোলাই মদ এখন খোলাখুলি বিক্রি হচ্ছে।

আরো ভয়ানক যে, দিনের আলোয় আপনার পুলিশের নাকের ডগায় চরস, আফিম, গাঁজা এমনকী ব্রাউনসুগার-এর কোটি কোটি টাকার ব্যবসা এখন পশ্চিমবঙ্গের কটেজ ইনডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। আচ্ছা ওখান থেকে কি পার্টির ফান্ডে আসছে? যদি না আসে তবে আপনি চুপ কেন? কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন জানালে এই পত্রলেখক বাধিত হয়। আপনার রাজ্যের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও দুর্ব্যবহারকারীরা যদি আপনার পৃষ্ঠপোষকতা পায় তাহলে আপনার কথায় যে ছোট ছোট ছেলেরা দুষ্টুমি করছে, এই বিশাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলে তো সন্ত্রাসবাদীরা আকাশের চাঁদ হাতে পাবে। ভারতবর্ষ আপনার প্রধানমন্ত্রী সময়কালে হয়তো তালিবান রাজ্যে পরিণত হবে বলে আশঙ্কা হয়— আপনার এই অতিরিক্ত মুসলিম তোষণ দেখে এবং আপনার অপরিণামদর্শী শাসকের ভূমিকা দেখে।

একবার নাগরিক ভোট নিন না। তারা আপনার এই অপরিণামদর্শিতার ভাগীদার হতে চায় কিনা যাচাই করুন না, আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ যা উপরে বর্ণিত হলো তাকে সামনে রেখে। দেখান না আপনার রাজনৈতিক ক্ষমতা যা আপনার পারিষদেরা চোখ বুজে প্রচার করে বেড়ায়। দয়া করে ব্যক্তিগত ভাবে নেবেন না। তাহলে এই একনায়কতন্ত্রের শাসনে হয়ত এই পত্রলেখকও কুনাল ঘোষ-এর মতো কারাগারে যাবে সত্যি কথা বলার জন্য।

ভাস্কর ভট্টাচার্য, আইনজীবী,
শ্রীরামপুর।

‘হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই’—এক অলীক স্বপ্ন

সুহাস বসু

গত শতাব্দীর তিরিশের দশকের কথা। আমার জন্ম ১৯২৯ সালে খুলনা জেলার কুমিরা গ্রামে। জ্ঞান হওয়া অবধি একটা কথা শুনে আসছিলাম। ‘হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই।’ ঠিক ভাই ভাই না হলেও গ্রামের এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ছিল না। কোনোদিন কোনো সাম্প্রদায়িক গোলমালের খবর দেখিনি বা শুনিনি। এল ১৯৪২ সালের সেই ‘ইংরেজ ভারত ছাড়’ আন্দোলন। তার অংশ হিসাবে ডাকা হলো হরতাল। সেই বালক বয়সেই তাতে অংশ নিয়ে কপালে জুটল পুলিশের বেটনের মার। ইংরেজ অবশ্য তখনকার মতো ভারত ছাড়ল না। কিন্তু অন্যদিকে শুরু হলো মুসলিম লীগের নেতৃত্বে এক ভ্রাতৃঘাতী আন্দোলন যার নায়ক ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। মুসলিম লীগ তথা জিন্নার দাবি ‘হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনো মিল নেই। মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি, তাদের একসঙ্গে বাস করা সম্ভব নয়। সেজন্য ভারতের মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলি নিয়ে গঠন করতে হবে পাকিস্তান নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র। তাতে থাকবে গোটা বাংলা, অসম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ’। তখন বাংলায় লোকসংখ্যা ছিল মুসলিম ৫৫ শতাংশ, আর হিন্দু ৪৪ শতাংশ। নেতাজী তখন দেশের বাইরে। গান্ধী-নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস তখন মুসলিম লীগের এই মারমুখী সাম্প্রদায়িক দেশ ভাগের দাবির বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে না তুলতে পেরে ক্রমশ পিছু হটছে, আর ও দিকে জিন্না ও মুসলীম লীগ দেশভাগ ও পাকিস্তানের পক্ষে সুর চড়াচ্ছেন। যাতায়াতের পথে দেখেছি বারাসাত ও বসিরহাটের অধিকাংশ মুসলমানের দোকানে লেখা ‘পাকিস্তান স্টোর্স’ যদিও তখনও পাকিস্তানের জন্ম হয়নি। এর মধ্যে আরম্ভ হলো ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। তার কিছু সুরাহা হওয়ার আশায় অধুনা লুপ্ত কমলালয় স্টোর্সের মালিক আমাদের পাশের গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় পাটকেল ঘাটার ফুটবল মাঠে এক সভা ডাকলেন। তাতে আমন্ত্রণ করা হলো তখনকার খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী হাঃ শঃ সুরাবর্দীকে। তিনি এলেন। স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতারা তাঁকে ইসলামের অধীশ্বর ইত্যাদি বলে স্মারকলিপি দিলেন। কিন্তু কোথায় খাদ্য, কোথায় দুর্ভিক্ষ অবসানের ইঙ্গিত।

মিঃ সুরাবর্দি তাঁর গোটা ভাষণে মুসলমানদের দুর্দশার জন্য হিন্দুদের দায়ী করলেন। আর বলা বাহুল্য, দ্বিজাতিতত্ত্বের জয়গান গেয়ে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবি জানালেন। এসব দেখেশুনে শ্রী চক্রবর্তী সখেদে মন্তব্য করলেন, এমন জানলে তিনি সুরাবর্দিকে আমন্ত্রণ জানাতেন না। এর পরের দু-তিন বছর চলল সমানে মুসলিম লীগের তীব্র দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান দাবির আন্দোলন আর কংগ্রেসের ক্রমাগত ব্যাকফুটে চলে যাওয়া। এল ১৯৪৬ সাল। বাংলায় তখন সেই কুখ্যাত সুরাবর্দির নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা। সঠিক তারিখ মনে নেই। তবে সেই বছরের মাঝামাঝি কলকাতা থেকে ডাঃ আহাদ নামে এক পশু চিকিৎসক আমাদের অঞ্চলে এসে ক্রমাগত বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াতে লাগলেন। আমি তখন দশম শ্রেণীতে পড়ি। টিফিনের সময় আমরা কয়েকজন ছাত্র নদীর ঘাটে উপস্থিত হয়ে সেই মুসলীম লীগ নেতা ডাঃ আহাদকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এখানে আমরা সব হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই, জন্মাবধি আমরা সবাই শান্তিতে বাস করছি। আপনি এখানে এসে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছেন কেন?’ উত্তরে ভীষণ রেগে গিয়ে তিনি হুঙ্কার দিলেন, ‘যা বলেছি সব ঠিক বলেছি। তোমাদের এতবড় সাহস যে আমাকে এইসব কথা শোনাতে এসেছো। আমি তোমাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি’। এই বলে তিনি গাড়ি সহ নৌকায় উঠে গেলেন।

এর কয়েকঘণ্টার মধ্যে সাতক্ষীরার এসডিও স্বয়ং হাইস্কুলে উপস্থিত হয়ে হেড মাস্টারমশাই আশুতোষবাবুকে নির্দেশ দিলেন যে সব ছাত্র ডাঃ আহাদ ও তাঁর গাড়ির উপর হামলা চালিয়েছিল অবিলম্বে তাদের চিহ্নিত করে রাসটিকেট করতে হবে। হেড মাস্টার মহাশয় পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। বিপদ বুঝে তিনি স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা বজলু মিঞার শরণাপন্ন হলেন। বজলু মিঞার চেষ্টায় স্কুল থেকে রাসটিকেট হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেলেও এই ঘটনার বছর খানেকের মধ্যে দিল্লীর মসনদে বসার লোভে গান্ধী-নেহরু মুসলিম লীগ তথা জিন্নার সেই দ্বিজাতিতত্ত্বের সাম্প্রদায়িক দাবির কাছে মাথা নত করে দেশ ত্রিখণ্ডিত করে পাকিস্তানের দাবি মেনে নিলেন। পূর্ব বাংলা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠন করা হলো। হিন্দু প্রধান খুলনা জেলাকে নির্দয় ভাবে পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়ায় আমি “সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া” সেই সাতপুরুষের ভিটেমাটি চিরতরে হারালাম। হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই বলার পরিণতি হাতে হাতে পেলাম।

‘হিন্দু মুসলমান পৃথক জাতি, কিছুতেই তাদের একসঙ্গে একদেশে বাস করা সম্ভব নয়। মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান চাইই’ ইত্যাদি বলে যাঁরা গলা ফাটাতেন সেই মুসলমানদের এবং তাদের যাঁরা সমর্থন করতেন তাঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য, দ্বিজাতিতত্ত্ব এখন কোথায় গেল? হিন্দুদের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করতে তো দেখছি এখন মুসলমানদের কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না। মাঝখান থেকে দেশ বিভাগ করে আমার ও আমার মতো লক্ষ লক্ষ নর-নারীর চরম সর্বনাশ করা হলো। তার খেসারত কে দেবে?

দ্বারহাট্টায় রক্তদান শিবির

প্রতি বছরের মতো এবারেও হুগলী জেলার দ্বারহাট্টা গ্রামের রূপকার ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের ১০৮ তম শুভ জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হলো ২৮ ফেব্রুয়ারি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবাবিভাগের পরিচালনায় ও লায়ন্স ক্লাব, ব্রাবোর্ন রোডের সহযোগিতায় দ্বারহাট্টায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই মহান কর্মসূচীর সূচনা হয় মহারাজের মূর্তিতে মাল্যার্পণের মধ্য দিয়ে। ৩৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে মানব সেবার আদর্শকে তুলে ধরেন। এছাড়াও রাজবলহাট কালচারাল সার্কেল ও সেবায়নের ব্যবস্থাপনায় ডাঃ প্রভাস দাস ও তাঁর সহকর্মীদের সহযোগিতায় বিনামূল্যে ই.সি.জি., ব্লাড প্রেসার, সুগার পরীক্ষা করেন প্রায় ৫৭ জন। এছাড়াও ৯৫ জনের চক্ষুপরীক্ষা করা হয়। ৪০ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হবে বলে ঠিক হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য অরবিন্দ দাশ, তারকেশ্বর জেলা প্রচারক গোপাল ঠাকুর, স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক বিজয় আঢ্য প্রমুখ। এই মহাকর্মযজ্ঞ এলাকার সকল মানুষের সাহায্য, সহযোগিতা ও আন্তরিক উপস্থিতিতে সাফল্যমণ্ডিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় ছিলেন প্রশান্ত দাস ও অদ্বৈতনাথ দে।

নবদ্বীপ নগরে বালক শিবির

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি শনিবার বিকাল ৪টা থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪ টা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নবদ্বীপ নগরের বালক শিবির নবদ্বীপ চটির মাঠ সংলগ্ন শ্রীশ্রী গৌর গোপীনাথ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত বালকের সংখ্যা ৪৪। উদ্বোধন করেন বৃন্দাবন ধর গোস্বামী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ বিভাগ প্রচারক উত্তম মাহাতো ও অন্যান্য কার্যকর্তাগণ। বিশিষ্ট নাগরিকরাও উপস্থিত ছিলেন। সমারোপ অনুষ্ঠানে দীক্ষান্ত ভাষণ দেন প্রাক্তন অধ্যাপক নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ ও বিশ্বহিন্দু পরিষদ নবদ্বীপ শাখার সভাপতি ডঃ অরুণ কুমার চক্রবর্তী।

মঙ্গলনিধি

গত ৪ মার্চ বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী খণ্ডের সিমলা শাখার স্বয়ংসেবক চন্দন ভুঁই-এর শুভবিবাহ উপলক্ষে প্রীতিভোজের আসরে তাঁর মা মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন সহ-জেলা প্রচারক সৃজন হাজরার হাতে। অনুষ্ঠানে ওই খণ্ডের অনেক স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

***

গত ৮ মার্চ পুরুলিয়া জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ রণজিৎ বাউরীর শুভবিবাহ উপলক্ষে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তার মা মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন স্বস্তিকা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকেশ মণ্ডলের হাতে। শ্রী মণ্ডল মঙ্গলনিধির রাশি সেবাকাজের জন্য জেলা কার্যবাহ দিলীপ গরাই-য়ের হাতে সমর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সহ-ব্যবস্থা প্রমুখ অশোক সাহা এবং অনেক কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

***

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি উত্তর মালদহ জেলার কলিগ্রাম শাখার স্বয়ংসেবক রবীন্দ্রনাথ দাস (ভীমদা) তাঁর কন্যা বর্ণালী দাসের শুভবিবাহ উপলক্ষে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন জেলা প্রচারক মথুরা হেঁসের হাতে। বিবাহ অনুষ্ঠানে অনেক কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

***

উত্তর মালদহ জেলার স্বরূপগঞ্জ খণ্ড সেবা প্রমুখ গৌতম মণ্ডল তাঁর শুভ বিবাহ উপলক্ষে গত ৪ মার্চ প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে

সমাবেশ সমাচার

মহকুমা কার্যবাহ বাদল প্রামাণিকের হাতে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে জেলা প্রচারক মথুরা হেঁস-সহ অনেক কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকে রাধাকান্ত বিশ্বাস

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার প্রাক্তন সঙ্ঘচালক রাধাকান্ত বিশ্বাস গত ৭ মার্চ পরলোকগমন করেন। মাত্র দু' মাস আগে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়। মৃত্যুকালে

তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর। কিছুদিন ধরে বয়সজনিত কারণে তিনি অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি আত্মীয়স্বজন ও বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তিকে রেখে গেছেন।

হুগলী জেলার ইটাচুনা গ্রামের তিনি বাসিন্দা। ইটাচুনা শ্রীনারায়ণ ইনস্টিটিউশনে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শিক্ষক ছিলেন। হুগলী গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ থেকে ১৯৯৪ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সদালাপী ও ব্যবহারের গুণে তিনি স্থানীয় সকলের কাছে শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

বাঁকুড়া কেন্দ্রের নজরকাড়া বিজেপি প্রার্থী

ডাঃ সুভাষ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এক ডাকে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষ ৬১ বছরের প্রথিতযশা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুভাষ সরকারকে চেনেন। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন প্রচারক প্রয়াত মনমোহন রায়ের সঙ্গে পরিচয় ও সঙ্ঘের শাখায় যাওয়া শুরু। দেশপ্রেমের পাঠগ্রহণ শুরু সেই কিশোর বয়স থেকেই। শাখার বালক গণশিক্ষক, মুখ্যশিক্ষক, কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৩ সালে সঙ্ঘের ১ম বর্ষ শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তারপর নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে ২য় বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা গ্রহণের পর সঙ্ঘের জেলা সহ-সঙ্ঘচালক হয়েছিলেন। ১৯৭৮-'৮০ দুই বছর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। রাজনীতিতে প্রয়োজন অনুভব করেই বাঁকুড়াবাসীর আহ্বানে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়ে প্রাদেশিক সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এবার বাঁকুড়া কেন্দ্রের তিনিই যোগ্যতম প্রার্থী। লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে ডাঃ সরকারের একান্ত সাক্ষাৎকার নেন স্বস্তিকার প্রতিনিধি। সাক্ষাৎকারটি এখানে প্রকাশ করা হলো।

❑ সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, জেলা সেবাপ্রমুখ হিসাবে অনেক সেবাকাজ পরিচালনা করেছেন, সেবাভাবী ডাক্তার রূপেও আপনার এতদঞ্চলে খুব পরিচিতি, হঠাৎ রাজনীতিতে এলেন কেন?

❑ আমি নিজে খুবই গরিব সাধারণ পরিবারে বড় হয়েছি। বাবার ছাতা সারানোর দোকান ছিল। তাই খুব ছোট থেকে গরিব মানুষের দুঃখকষ্ট মনকে নাড়া দিত। ক্লাস টেনে যখন পড়তাম তখন থেকেই মনে হোত কীভাবে মানুষের কষ্ট দূর করা যায়। যুব সমাজের হাতে কোনো কাজ ছিল না। মানুষ অভাব অনটনে দিন চালাতো। এগুলি আমাকে বিচলিত করতো। মনে হোত যদি কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হই তাহলে রাষ্ট্রের নীতি নির্ণায়কের ভূমিকায় যেতে চেষ্টা করবো, যাতে গরিব মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যায়। ২০১৩ সালে আমার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আমাকে রাজনীতিতে আসার জন্য উৎসাহিত করেন। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার আমার অনেক রোগীও আমাকে ভোটে দাঁড়ানোর জন্য বলেন। সর্বোপরি বাঁকুড়াবাসীর ইচ্ছায় আমি রাজনীতিতে আসি।

❑ ন'বারের জয়ী সিপিএমের বাসুদেব আচারিয়া ও অভিনেত্রী মুনমুন সেনের মতো দু'জন হেভিওয়েট প্রার্থীর বিরুদ্ধে কীভাবে জিতবেন?

❑ ৩৩ বছর ডাক্তারি পেশায় থাকার জন্য এলাকার বহু বহু মানুষের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাঁরাও আমাকে 'আপনজন' হিসাবেই দেখেন। তাঁদের আশীর্বাদ আমার ওপরেই আছে। সিপিএম এখন ডুবন্ত আর বাসুদেব আচারিয়া বাঁকুড়ার মানুষের নাগালের বাইরে। সিনেমা জগতের গ্লামারাস মুনমুন সেনকে

এক নজরে বাঁকুড়া কেন্দ্র

❑ বাঁকুড়া কেন্দ্রে দুটি পুরসভা— বাঁকুড়া এবং রঘুনাথপুর।

❑ রঘুনাথপুর-১, নিতুড়িয়া, সাঁতুড়ি, শালতোড়া, মেজিয়া, ছাতনা, ইঁদপুর, রানিবাঁধ, হীরাবাঁধ, খাতরা, রাইপুর, সারেঙ্গা, সিমলাপাল এবং বাঁকুড়া-১ এই ব্লকগুলি এই কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও গঙ্গাজলঘাঁটির চারটি পঞ্চায়েত। তালডাংরার ছটি পঞ্চায়েত ও বাঁকুড়া-২ এর তিনটি পঞ্চায়েত এই কেন্দ্রের অন্তর্গত।

❑ এই আসনের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র হলো রঘুনাথপুর। শালতোড়া, ছাতনা, রানিবাঁধ, রাইপুর, তালডাংরা এবং বাঁকুড়া।

❑ গত লোকসভা নির্বাচনে বামপ্রার্থী ভোট পান ৪৭.৬৬ শতাংশ, তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট ৩৬.৭১ শতাংশ, বিজেপি ৪.৩৩ শতাংশ। (রাহুল সিন্‌হা-৪২,৬৬০)

❑ গত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ৪২.৪ শতাংশ, তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট ৪৬.৬ শতাংশ, বিজেপি ৩.৯৬ শতাংশ।

❑ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট ৪১.৪৭ শতাংশ, তৃণমূল ৪৯.৯৯ শতাংশ, কংগ্রেস ২.৬৪ শতাংশ, বিজেপি ২.৫৬ শতাংশ।

জনসম্পর্ক অভিযানে ডাঃ সরকার।

তো বাঁকুড়ার মানুষ কোনোদিন কাছেই পাবে না— এটা বাঁকুড়ার সবাই জানে।

■ **ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসাবে মসজিদে দোয়াভিক্ষার ব্যাখ্যা কীভাবে দেবেন?**

■ ভারতীয় জনতাপার্টি সব ধর্মের সব মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মুসলমান সমাজকে ভোটব্যাঙ্কের হাতিয়ার রূপেই দেখে। তাঁদের সত্যিকারের উন্নতির কথা ভাবে না। আমরা তাঁদের এই দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবেই দেখি ও শ্রদ্ধা করি।

■ **মন্দিরের পাশাপাশি আপনি গির্জা ও মসজিদে গিয়েছেন। তাঁদের আস্থা আপনি কতটা অর্জন করতে পারবেন?**

■ তাঁদের আস্থা আমার ওপর আছেই। তাঁরা জানেন ডাক্তার হিসাবে আমি কোনোদিন ভেদাভেদ করি না। তাঁরাও আমাকে দু'হাতে আশীর্বাদ করবেন।

■ **প্রচারে আপনি কীভাবে এগিয়ে আছেন?**

■ সমাজসেবক ও চিকিৎসক হিসাবে এলাকায় ৫০ হাজার পরিবারের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। আমি প্রতিদিন ব্যক্তিগতভাবে এক এক এলাকায় লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করছি। এছাড়া বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতী আমার সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। যেমন ধরুন, এমসিএ শুভেন্দু দাস, সৌরভ পাত্র, সৌরভ সিংহ— এরা নিজেরাই সক্রিয়ভাবে প্রতিদিন আমার বিভিন্ন প্রচার কাজের তথ্য সোস্যাল

সোস্যাল মিডিয়ার কার্যকর্তাদের সঙ্গে ডাঃ সরকার।

মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ভাল সাড়া লক্ষ্য করছি। বাঁকুড়া লোকসভায় ১৯১৪টি বুথের প্রতিটিতেই আমার পৌঁছনোর লক্ষ্য আছে। ইতিমধ্যে নরসুন্দর সম্মেলন হয়েছে। ভাল সাড়া পেয়েছি। নভেম্বরের শুরুতেই কার্যকর্তা বৈঠক হয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নাতি সিদ্ধার্থনাথ সিং উপস্থিত ছিলেন। বাঁকুড়ার বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে চা-চক্র হয়। তাতে সবাই মোদীজীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান বলে মত প্রকাশ করেছেন।

■ জিতলে আপনি কী করবেন?

■ বাঁকুড়া তথা পশ্চিমবাংলার প্রয়োজনের কথা সংসদে বেশি উত্থাপন করবো।

■ অগ্রাধিকার?

■ বাঁকুড়ার যুবকদের ভিনরাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে তাদের রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করা। এবং পুরো এলাকায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার সার্থক রূপায়ণ করা।

নদী পরিকল্পনা— নদীর ওপর বাঁধ ও জোড়বাঁধ তৈরি করে সেচের সুবন্দোবস্ত করা ও গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। জঙ্গলমহলের আর্থ-সামাজিক উন্নতি। বাঁকুড়া-ছাতনা ও বাঁকুড়া- মেজিয়া রেলপথ তৈরির দাবি জানাব।

এম পি ফান্ডের টাকাও ভালভাবে খরচ করে মানুষের সেবায় লাগাতে চাই।

বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্র

■ সাতটি বিধানসভা নিয়ে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্র। কেন্দ্রগুলি হলো— রঘুনাথপুর, শালতোড়া, ছাতনা, রানিবাঁধ, রাইপুর, তালডাংড়া ও বাঁকুড়া। এই কেন্দ্রের বুথসংখ্যা ১৯৯৪। মোট ভোটার ১৪ লক্ষ।

রঘুনাথপুরে দু'টি পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর কাজ শুরু হলেও জমি অধিগ্রহণ, **water coridor** প্রভৃতি বিষয়ে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পানীয় জল, কৃষির জন্য সেচের জল, দ্রুত জলস্তর নেমে যাওয়া এই বিধানসভার প্রধান সমস্যা। শালতোড়া বিধানসভা এলাকা নদী ও জোড়ের সংস্কার না হওয়ায় এলাকা জুড়ে রিভার পাম্পগুলি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ফলে কৃষক চাষ করতে পারছে না। পুরো এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা খুব বড় সমস্যা। বাঁকুড়া-শালতোড়া রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে ভেঙে গর্ত হয়ে আছে, কোনো সংস্কার হয়নি। সরকার পরিবর্তনের আড়াই বছরের পরও চিত্র একই। খনিজ কয়লার চোরাচালানের একটি বড় চক্র রয়েছে। এলাকার মানুষের ধারণা এই কাজে প্রশাসনের কোনো কোনো লোক যুক্ত।

ছাতনা বিধানসভা ক্ষেত্রে দ্বারকেশ্বর ও গন্ধেশ্বরী নদীর কোনো পরিকল্পনা না থাকায় নদী মাঠে পরিণত হয়েছে। শুশুনিয়া পাহাড় ও প্রস্রবণকে কেন্দ্র করে একটা ভাল পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠলে এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নতি সম্ভব হোত। কিন্তু এসব কিছুই হয়নি। পরিকল্পনার অভাবে এলাকা দারুণভাবে অবহেলিত। পাহাড়-জঙ্গল রক্ষা হচ্ছে না। বন্যপ্রাণীও নিঃশেষ হওয়ার পথে। ছাতনা-মুকুটমণিপুর রেলপথের কাজ শুরু হয়েও সঠিক তদারকির অভাবে কাজ হচ্ছে না। ছাতনা-বাঁকুড়া সড়কপথের অবস্থাও খুবই সঙ্কটজনক।

বাঁকুড়া বিধানসভায় জেলার সদর শহর বস্তিবাসীর সংখ্যা অনেক। কয়েক বছর ধরে ভিন্ন ভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত সমস্যার সুরাহা হয়নি। বাঁকুড়ায় ভাল স্টেডিয়াম, সংস্কারিত খেলার মাঠ, ভাল অডিটোরিয়াম নাই। কিছু কিছু অঞ্চলে সেনিটেশনের সমস্যা, ফুটপাতের সমস্যা রয়েছে। তাঁত, ডোকরা, কাঁসা, পিতল ও মৃৎশিল্প ভীষণভাবে অবহেলিত।

বাঁকুড়া-দুর্গাপুর সঙ্কীর্ণ রাস্তা। যানবাহন অনুসারে পরিসর খুব কম ও দুর্ঘটনাপ্রবণ। ৪ সরণীর **(Four Lane)**-র রাস্তা হওয়া আশু প্রয়োজন। দামোদর ব্রীজ ও জলাধার লাগোয়া অংশে নদীর ওপর আর একটি সেতু হওয়া প্রয়োজন। রাণিগঞ্জ-বাঁকুড়া রেলপথ প্রয়োজন।

সদর হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ অতি পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও সম্মিলিনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল অবহেলিত। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে একে সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে পরিণত করা জরুরি। ৫টি জেলার রোগীর পরিষেবা দেয় এই হাসপাতাল।

তালডাংরা বিধানসভার পাঁচমূড়ার মৃৎশিল্প সারা বিশ্বে জায়গা করে নিতে পারে যদি শিল্পীরা পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা ও বাজার পান। এই অঞ্চলের রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব ভাল নয়। কৃষিজমি খুব উর্বর কিন্তু নায্যমূল্য ও নিয়ন্ত্রিত বাজার এবং রপ্তানীর সুবিধা না থাকায় চাষীরা মার খাচ্ছেন। ফসল ও সবজি সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই।

রাইপুর ও রাণিবাঁধ বিধানসভা এলাকার মহকুমা শহর খাতড়া। এস ডি ও অফিস, কোর্ট, স্টেট জেনারেল হসপিটাল সবই আছে কিন্তু পৌরএলাকা না হওয়ায় উন্নয়ন স্তব্ধ। খাতড়ায় একটি বাসস্ট্যান্ড প্রয়োজন। মুকুটমণিপুর ও ঝিলিমিলিকে কেন্দ্র করে একটি ভালো পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। তাহলেই জঙ্গলমহলে কিছুটা উন্নতি ঘটবে। কৃষি, উদ্যান, পশুপালন, পরিবেশবান্ধব শিল্প গঠন এই অঞ্চলের **natural resource** হতে পারে।

শিমলা পাল, খাতড়া, রানিবাঁধ, ঝিলিমিলি, লক্ষ্মীসাগর, তালডাংরা ও রাইপুরকে কেন্দ্র করে গোপালন ও দুগ্ধ সমবায়ের মাধ্যমে একটা উন্নত শিল্পাঞ্চল তৈরি করার প্রচণ্ড সম্ভাবনা আছে। গুজরাট মডেলের সফল প্রয়োগ এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে হতে পারে। শিলাবতী ও ভৈরবাঁকী নদীর ওপর সেতু খুবই প্রয়োজন।

লোকসভা : ১৯৫২ থেকে ২০০৯

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

১৯৫২ : দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এই বছর। কংগ্রেস ৩৬৪টি আসন সমেত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে ভারতীয় জনসঙ্ঘ ৩টি আসনে জয়লাভ করে। জেপি এবং আচার্য নরেন্দ্র দেবের নেতৃত্বাধীন সোসালিস্ট পার্টি ১২টি আসন পায়, অন্যদিকে জেবি কৃপালনির কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি ৯টি আসন দখল করে।

১৯৫৭ : দেশের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস আবারও ক্ষমতায় আসে। ভারতীয় জনসঙ্ঘের ভোট দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পায় এই নির্বাচনে। আম্বেদকরের 'অল ইন্ডিয়া সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন' ৬টি আসনে জয়ী হয়। বামপন্থীরা দখল করে ৩৩টি আসন।

১৯৬২ : প্রথম দু'টি নির্বাচনের ফলাফলই বজায় থাকে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো— রামমনোহর লোহিয়া পিএসপি ছাড়তে বাধ্য হন এবং তাঁর অনুগামীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নতুন ভাবে তৈরি সোসালিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে।

১৯৬৭ : পূর্বের নির্বাচনের চেয়ে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা অনেক কমে যায় দেশের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে। ঠিক একই হারে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ভারতীয় জনসঙ্ঘের। আঞ্চলিক দল হিসাবে ডি এম কে এবং অকালি দল ২৮টি আসনে জয়ী হয়। জর্জ ফার্নাণ্ডেজ এবং অন্যান্যরা পিএসপি ভেঙে বেরিয়ে এসে তৈরি করেন সংযুক্ত সমাজবাদী পার্টি (এস এস পি)।

১৯৭১ : ১৯৬৯ সালে ইন্দিরা গান্ধী পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন এবং নতুন দল গঠন করেন। দেশের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে গরিবি হঠাও স্লোগানকে সামনে রেখে ইন্দিরার কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আসে।

১৭৭৭ : দিল্লীতে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার তৈরি হয় দেশের ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের রায় প্রতিফলিত হয় এই নির্বাচনে। খোদ ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত পরাস্ত হন। কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি (বামেদের কাছে) এককাট্টা হয়ে তৈরি করে জনতা পার্টি এবং চরণ সিং-এর রাষ্ট্রীয় লোকদলের প্রতীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। মোরারজি দেশাই হন প্রধানমন্ত্রী।

১৯৮০ : ক্ষমতায় আসার ২ বছরের মাথায় জনতা পার্টির জোট ভেঙে যায়। ১৯৭৯ সালে রাজনারায়ণ, চরণ সিং, জর্জ ফার্নাণ্ডেজরা জনসঙ্ঘের নেতাদের চাপ দিতে থাকেন আর এস এসের সদস্যপদ ছাড়ার জন্য। কিন্তু জনসঙ্ঘের নেতারা নিজেদের অবস্থানেই অনড় থাকেন। ফলে অকাল নির্বাচন হয় এই বছর। ক্ষমতায় আসেন ইন্দিরা গান্ধী।

১৯৮৪ : ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সহানুভূতির হাওয়ায় দেশের অষ্টম সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে কংগ্রেস। জনসঙ্ঘের নতুনরূপ ভারতীয় জনতা পার্টি অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ২টি আসনে জয়ী হয়।

১৯৮৯ : বোফোর্স কেলেঙ্কারি, পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি ঘটনার কারণে ব্যাপক ধাক্কা খায় কংগ্রেস। তাদের আসন ৪০৪ থেকে নেমে আসে ১৯৭-তে। চমকপ্রদ উত্থান হয় ভারতীয় জনতা পার্টির, ২টি আসন থেকে তারা পৌঁছে যায় ৮৫টি আসনে। ভিপি সিং-এর সরকারকে বিজেপি বাইরে থেকে সমর্থন করে।

১৯৯১ : কোনো দলই একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি দেশের দশম সাধারণ নির্বাচনে। ত্রিশঙ্কু সরকার তৈরি হয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে, প্রধানমন্ত্রী হন পিভি নরসিমা রাও। পূর্বের চেয়ে আরও বেশি আসনে জয়ী হয় বিজেপি।

১৯৯৬ : কংগ্রেসকে হারিয়ে একক বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে আসে বিজেপি। বিজেপি-র সরকার তৈরি হয় অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে। কিন্তু মাত্র ১৩ দিনের মাথায় এই সরকার পড়ে যায়। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সমর্থনে জনতা দল সরকার তৈরি করে। প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া। এর ঠিক এক বছর বাদে প্রধানমন্ত্রী হন আই কে গুজরাল।

১৯৯৮ : পুনরায় বিজেপি একক বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে আসে। বিজেপি-র নেতৃত্বে ১৩টি দলের জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন অটল বিহারী বাজপেয়ী। পরে এ আই এ ডি এম কে সমর্থন তুলে নিলে মাত্র ১৩ মাসের মাথায় পড়ে যায় এই সরকার।

১৯৯৯ : বিজেপি আবারও ক্ষমতায় আসে। বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার দেশের প্রথম জোট সরকার হিসাবে ৫ বছর মেয়াদ পূর্ণ করে।

২০০৪ : বিজেপি-র চেয়ে মাত্র ৭টি বেশি আসনে জয়লাভ করে কংগ্রেস। বামেদের সমর্থনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে তৈরি হয় ইউপিএ সরকার। প্রধানমন্ত্রী হন মনমোহন সিং।

২০০৯ : এই নির্বাচনেও ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস। বামপন্থীদের আসন কমে যায়।

লোকসভায় দলগুলির অবস্থান : ১৯৫১ থেকে ২০০৯

সাল	মোট ভোটার	প্রদত্ত ভোটের হার	মোট আসন	কংগ্রেস আসন (প্রাপ্ত ভোট %)	জনসঙ্ঘ বা বিজেপি (প্রাপ্ত ভোট %)	বামপন্থী দল (প্রাপ্ত ভোট %)	সোসালিস্ট (প্রাপ্ত ভোট %)	আঞ্চলিক দল (প্রাপ্ত ভোট %)	দক্ষিণপন্থী দল (প্রাপ্ত ভোট %)	অন্যান্য (প্রাপ্ত ভোট %)
১৯৫২	১৭ কোটি	৪৪.৯%	৪৮৯	৩৬৪ মোট ভোটের (৪৫%)	৩ মোট ভোটের (৩%)	২০ মোট ভোটের (৫%)	২৩ মোট ভোটের (১৯%)	× মোট ভোটের ×	× মোট ভোটের ×	৭৯ মোট ভোটের (২৮%)
১৯৫৭	১৯ কোটি	৪৫.৪%	৪৯৪	৩৭১ ৪৮%	৪ ৬%	৩৩ ১১%	২৫ ১২%	×	×	৬১ ২৩%
১৯৬২	২২ কোটি	৫৫%	৪৯৪	৩৬১ ৪৫%	১৪ ৬%	৩১ ১১%	২১ ১২%	১০ ৩%	১৮ ৮%	৩৯ ১৫%
১৯৬৭	২৫ কোটি	৬১%	৫২০	২৮৩ ৪১%	৩৫ ৯%	৪৬ ১১%	৩৭ ১০%	২৮ ৪%	৪৪ ৯%	৪৭ ১৬%
১৯৭১	২৭ কোটি	৫৫%	৫১৮	৩৫২ ৪৪%	২২ ৭%	৫৩ ১২%	৫ ৩%	২৪ ৫%	৮ ৩%	৫৪ ২৬%
১৯৭৭	৩২ কোটি	৬০%	৫৪২	১৫৪ ৩৫%	জনতা পার্টি ২৯৫ (৪১%)	৪১ ৮%	জনতা পার্টি	২৯ ৬%	জনতা পার্টি	২৩ ১০%
১৯৮০	৩৫ কোটি	৩৭%	৫৪২	৩৫৩ ৪৩%	×	৫৪ ১০%	৭২ ২৮%	১৯ ৫%	×	৪৪ ১৪%
১৯৮৪	৩৮ কোটি	৬৪%	৫১৪	৪০৪ ৪৯%	২ ৮%	৩৮ ১০%	১৩ ১৩%	৪৪ ৮%	×	১৭ ১২%
১৯৮৯	৫০ কোটি	৬২%	৫২৯	১৯৭ ৪০%	৮৫ ১১%	৫২ ১০%	১৪৩ ১৮%	১৩ ৭%	×	৩৯ ১৪%
১৯৯১	৫০ কোটি	৫৭%	৫২১	২৩২ ৩৫%	১২০ ২০%	৫৬ ১০%	৬৪ ১৫%	৩০ ৯%	×	১৯ ১০%
১৯৯৬	৬০ কোটি	৫৮%	৫৪৩	১৪০ ২৯%	১৬১ ২০%	৫২ ৯%	৫৪ ১০%	৮৪ ১৫%	×	৫২ ১৭%
১৯৯৮	৬১ কোটি	৬২%	৫৪৩	১৪১ ২৬%	১৮১ ২৬%	৪৮ ৮%	×	১২৬ ২৯%	×	৪৬ ১২%
১৯৯৯	৬২ কোটি	৬০%	৫৪৩	১১৪ ২৮%	১৮২ ২৪%	৪২ ৮%	×	১৬২ ২৯%	×	৪৩ ১১%
২০০৪	৬৭ কোটি	৫৮%	৫৪৩	১৪৫ ২৭%	১৩৮ ২২%	৫৯ ৮%	×	১৫৩ ৩১%	×	৪৮ ১২%
২০০৯	৭২ কোটি	৫৮%	৫৪৩	২০৬ ২৯%	১১৬ ১৯%	২৪ ৭%	×	১৬৪ ২৮%	×	৩৩ ১৭%

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
24 March - 2014